প্রকাশক ঃ
বিধুভূষণ দাসগুপ্ত
সি-১৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিপদ সামন্ত
কে. বি. প্রিণ্টার্স
১।১এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বঙ্গ ভারতীর সুযোগ্য সেবক পরম শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষ মহাশয়ের করকমলে—

আমার মত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীলকে যাঁরা সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা গান্ধী-আদর্শ প্রচারের সুযোগ সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন।

ভূমিকা

সত্যকার আত্মজীবনী বা জীবনচরিত লেখার প্রয়াস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। জীবনে আমি সত্য নিয়ে যে অসংখ্য প্রয়োগ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তার বিবরণ দেওয়াই কেবল আমার লক্ষ্য। আর আমার জীবনে ঐ সব সত্যের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নেই বলে এই কাহিনী স্বভাবতই আত্মজীবনীর রূপ পরিগ্রহ করবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তা এখন সর্বজন বিদিত। তাই আমি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের প্রয়োগ সমূহ এখানে বর্ণনা করতে ইচ্ছুক। কারণ এর কথা আমি ছাড়া আর কারও জানা নেই। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আমি যেটুকু শক্তি পেয়েছি তা এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের প্রয়োগসঞ্জাত। আমি যে সব প্রয়োগের কথা বলতে যাচ্ছি সেগুলি আধ্যাত্মিক, অথবা হয়ত এদের নৈতিক বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে। কারণ নীতিই ধর্মের সার।

ধর্মের যে সব ব্যাপার বয়স্কদের মত শিশুদের পক্ষেও বোঝা সহজ, সেইগুলিকেই আমার কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করব। নিরাসক্ত হয়ে ও নম্রভাবে এই কাহিনী বর্ণনা করতে পারলে আরও অনেক প্রয়োগকারী এর থেকে তাঁদের চলার পথে সাহায্য পাবেন।

আশ্রম, সবরমতী
২৬শে নভেম্বর, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ

মো. ক. গান্ধী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আমার জীবন কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ এই পুস্তকের প্রকাশক অভিন্নহৃদয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাসগুপ্তের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর প্রচেষ্টাতেই এর প্রথম সংস্করণ বাংলা দেশের ছাত্র ও কিশোর কিশোরীদের হাতে পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁরই পরামর্শ মত নূতন একটি অধ্যায় (পর্বত প্রমাণ ভুল) সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে জড়িত এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির সম্বন্ধেও তরুণ পাঠকেরা জানতে পারেন।

প্রথম সংস্করণের মত বর্তমান সংস্করণও পাঠক সমাজে আদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

—অনুবাদক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

— —

এই অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধীর	আমার ধ্যানের ভারত (চতুর্থ সংস্করণ)	৪'৫০
	ছাত্রদের প্রতি (তৃতীয় সংস্করণ)	৫'০০
	শিক্ষা	১৫'০০
	আমার ধর্ম (দ্বিতীয় সংকরণ)	৫'০০
	সত্যাগ্রহ	৭'৫০
	পল্লীপুনর্গঠন (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩'০০
কিশোরলাল মশরুওয়ালার		
	গান্ধী ও মার্কস্	৩'০০
আল্‌ডুস্ হাক্সলের	বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি	২'০০
	এপ অ্যাণ্ড এসেন্স (উপন্যাস)	৪'০০
আইনস্টাইনের	জীবন-জিজ্ঞাসা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১০'০০
মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থ	সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩ ০০
	সত্যাগ্রহের কথা	
সম্পাদিত গ্রন্থ	My Non-Violence (M. K Gandhi)	5'00
	My Views (Albert Einstein)	10'00
	গান্ধী-পরিক্রমা	

READ GANDHIAN LITERATURE

		Rs. nP.
An Autobiography (or My Experiments with Truth)	By M. K. Gandhi	3·00
My Non-Violence	„ „	5·00
Basic Education	„ „	1·00
Sarvodaya (The Welfare of all)	„ „	2·50
Satyagraha	„ „	5·50
Women and Social Injustice	„ „	3·00
Hind Swaraj	„ „	0·50
Constructive Programme	„ „	0·37
Selections from Gandhi	Nirmal Kumar Bose	2·00
Gandhi & Marx	K. G. Mashruwalla	1·00
Bhoodan Yajna	Vinoba Bhave	0·87
Which Way Lies Hope ?	Richard B. Gregg	1·25
A Philosophy For The Economic Development of India	„ „	2·50

আমার জীবন কাহিনী

প্রথম খণ্ড : শৈশব ও যৌবন

: ১ :

জন্ম ও পিতৃমাতৃ পরিচয়

আমার পিতা করমচাঁদ গান্ধী পোরবন্দরের দেওয়ান ছিলেন। তিনি স্বজাতিপ্রেমী, সত্যাশ্রয়ী, সাহসী ও উদার স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তবে অল্পতেই তিনি কুপিত হতেন।

প্রভূত বিত্ত সঞ্চয়ের আগ্রহ কদাপি তাঁর ছিল না এবং আমাদের জন্য বেশী কিছু সম্পত্তি তিনি রেখেও যান নি।

তিনি কোন রকম স্কুল বা কলেজী শিক্ষা পান নি। খুব বেশী হলে বলা যেতে পারে যে তিনি গুজরাটীতে পঞ্চম মান পর্যন্ত পড়েছিলেন। ইতিহাস ভূগোল সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। তবে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকার ফলে জটিলতম সমস্যাবলীর সমাধান এবং শত শত ব্যক্তির সঙ্গে কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁকে বেগ পেতে হত না। তিনি বিশেষ একটা ধর্মীয় শিক্ষা পান নি তবে অধিকাংশ হিন্দুর মত প্রায়ই মন্দিরে যাতায়াত করে এবং ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির চর্চা শ্রবণ ক'রে তিনি এক ধর্মীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

আমার স্মৃতিপটে মায়ের ছবি একান্ত সাধ্বীরূপে চিত্রিত। তিনি অতীব ধর্মপরায়ণা ছিলেন। নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা অর্চনা

না করে আহার্য গ্রহণ তাঁর পক্ষে অচিন্ত্যনীয় ছিল। হাবেলী অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দিরে যাওয়া তাঁর প্রাত্যহিক কর্তব্য ছিল। আমার স্মরণ কালের মধ্যে কখনও তিনি চতুর্মাস ব্রত বাদ দেন নি। তিনি বহু কঠোর ব্রত গ্রহণ করতেন এবং যা-ই হক না কেন, সেই সব ব্রত পালন করতেন। অসুস্থতার অজুহাতে কখনও কোন ব্রত উদ্‌যাপনে শৈথিল্য দেখা যায় নি। আমার মনে আছে একবার চতুর্মাস ব্রতকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন; কিন্তু ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান পালনের পথে এই অসুস্থতাকে বাধক হতে দেওয়া হয় নি। পর পর দুই দিন উপবাস করা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। চতুর্মাস পালনকালে একবেলা আহার করে থাকা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ঐ সময় একদিন অন্তর একদিন একেবারে উপবাস করতেন। আব একবার চতুর্মাসের সময় তিনি সূর্য না দেখে আহার করবেন না বলে স্থির করেন। সেই সময় আমরা ছেলের দল মায়ের কাছে সূর্যের আবির্ভাব ঘোষণা কববার জন্য সমস্ত দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সকলেই জানেন যে ঘন বর্ষার সময় কখনও কখনও দিনের পর দিন সূর্যের মুখ দেখাই যায় না। আমার মনে আছে এমন বহু দিন গেছে যখন সূর্যের অতর্কিত আবির্ভাব দেখে আমরা মাকে সংবাদ দেবার জন্য দৌড়ে গেছি। আমাদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনি স্বচক্ষে সূর্য দর্শনের জন্য বাইরে আসতেন। কিন্তু ততক্ষণে সূর্যদেব আবার অদৃশ্য হয়ে গেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও আহার্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। মা কিন্তু উৎফুল্ল

কণ্ঠেই বলতেন, "তাতে কি হয়েছে ? আজ আমি আহার করি এ ভগবানের অভিপ্রেত নয়।" এই বলে তিনি সংসারের জোয়াল কাঁধে নেবার জন্য প্রত্যাবর্তন করতেন।

মার সাধারণ বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। দেশীয় রাজ্যটির যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল।

এইরূপ পিতামাতার গৃহে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পোরবন্দর বা সুদামাপুরীতে আমার জন্ম হয়।

: ২ :

বিদ্যালয়ে

পোরবন্দরে আমার শৈশব অতিবাহিত হয়। পাঠশালায় যাওয়ার কথা আমার মনে পড়ে। নামতা মুখস্ত করতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হত। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে গুরুমশায়ের উদ্দেশ্যে কখন কখন কটুকাটব্য করেছি—এ ছাড়া তখনকার কথা আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

বাবা যখন পোরবন্দর ছেড়ে রাজকোটে যান তখন আমার বয়স বোধ হয় সাত বৎসর। সেখানে আমাকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় এবং তখনকার জীবনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। পোরবন্দরের মত এখানেও পড়াশুনা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছু নেই। এখান থেকে আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাই ও সেখান থেকে যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলাম তখন আমার বয়স ১২ বৎসর। এই অল্প কালের মধ্যে আমার

শিক্ষক বর্গ বা সহপাঠিদের কাছে একটিও মিথ্যা উক্তি করেছি বলে মনে আমার পড়ে না। আমি খুব লাজুক স্বভাবের ছিলাম এবং সর্ব প্রকারে সঙ্গী-সাথী এড়িয়ে চলতাম। বই এবং স্কুলের পড়া—এই ছিল আমার একমাত্র সাথী। আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল ঠিক ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে হাজির হওয়া ও ছুটি হওয়া মাত্র উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ী ফেরা। সত্য সত্যই আমি একরকম উর্ধ্বশ্বাসেই ফিরতাম। কারণ আমি কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করার কথা ভাবতেই আতঙ্কিত হতাম। কেউ আমার সঙ্গে যদি কোন ঠাট্টা করে—এই ভয়ে আমি ব্যাকুল থাকতাম।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষার সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। শিক্ষা বিভাগীয় পরিদর্শক গিলেস সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য এসেছিলেন। আমরা কতটা বানান করতে শিখেছি দেখার জন্য তিনি আমাদের পাঁচটি ইংরাজী শব্দ লিখতে দেন। এর ভিতর একটি শব্দ ছিল “Kettle”। আমি ভুল বানান লিখি। শিক্ষক মহাশয় আমার পায়ে জুতার ঠোকর দিয়ে আমার ভুল শুধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি কিন্তু সেই ইশারা বোঝার চেষ্টাই করলাম না। তিনি যে আমাকে পার্শ্ববর্তী বালকের শ্লেট দেখে শুদ্ধ বানান টুকে নিতে বলেছেন, একথা আমার মনে একেবারেই ওঠে নি। কারণ আমি জানতাম যে যাতে কেউ কারও লেখা দেখে না টুকি সেইজন্যই শিক্ষক মহাশয় পাহারা দিচ্ছেন। ফলে দেখা গেল যে আমি ছাড়া আর সব কটি ছেলেই সবগুলি বানান শুদ্ধ করে লিখেছে আর আমিই শুধু বোকা প্রতিপন্ন হলাম। শিক্ষক

মহাশয় পরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে আমার এভাবে বোকামী করা ঠিক হয় নি। আমি কিন্তু তাঁর কথা বুঝি নি। "নকল" করার বিদ্যা শেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

তবে এ ঘটনায় আমার মনে সেই শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি বিন্দু মাত্র বিরূপস্পৃহার ভাব আসে নি। আমার স্বভাবই ছিল গুরুজনদের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকা। পরে এই শিক্ষক মহাশয়ের অন্য অনেক দোষের কথাও আমি জানতে পারি; কিন্তু তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অটুটই থাকে। কারণ আমি গুরুজনদের নির্দেশ পালন করতেই শিখেছিলাম; তাঁদের কার্যকলাপের সমালোচনা করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

এই সময়ের আরও দুটি ঘটনার কথা আমার মনে চিরজাগরূক হয়ে আছে। সাধারণতঃ আমি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিশেষ কিছু পড়তে চাইতাম না। আমি শাস্তি পেতে চাইতাম না এবং শিক্ষককে প্রতারিত করার ইচ্ছাও হত না বলে রোজকার পড়া রোজই তৈরী করতাম। তবে সময় সময় তাতে মন বসত না। অতএব ভালভাবে যখন স্কুলের পড়াই তৈরী হত না, তখন বাইরের কিছু পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাবার কেনা একখানা বইয়ের উপর একবার আমার চোখ পড়ল। বইটির নাম ছিল "শ্রবণ পিতৃভক্তি নাটক"*। গভীর আগ্রহের

* অন্ধ মাতাপিতার প্রতি অতীব ভক্তিপরায়ণ তরুণ মুনি শ্রবণকুমার মাতা-পিতাকে তীর্থদর্শন করাবার জন্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ তাঁকে ভুলক্রমে হত্যা করেন।

সঙ্গে আমি বইখানি পড়ি। সেই সময় আমাদের ওখানে ভ্রাম্যমান ছায়াছবির একটি দল আসে। এর ভিতর একটি চিত্রে দেখলাম যে বাম কাঁধে শ্রবণ অন্ধ মাতাপিতাকে তাঁর দুই দিকে ঝুলিয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছেন। ঐ নাটক ও ছবি আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেল। মনে মনে বললাম, "এতদিনে একটা অনুকরণ যোগ্য উদাহরণ পাওয়া গেল।"

প্রায় এই সময়েই আমি বাবার কাছ থেকে 'হরিশ্চন্দ্র" দেখার অনুমতি পাই। এই নাটক আমার চিত্ত জয় করল। যতবারই এর অভিনয় দেখি না কেন, আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করতাম না। কিন্তু কতবারই বা আমাকে অভিনয় দেখার অনুমতি দেওয়া হত? সদা সর্বদা আমি এরই কথা ভাবতাম এবং মনে মনে কতবার যে আমি হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। দিবারাত্র আমার মনে প্রশ্ন জাগত, "সকলেই কেন হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যনিষ্ঠ হয় না?" সত্যমার্গ অবলম্বন করে হরিশ্চন্দ্রের মত অগ্নিপরীক্ষা দেবার আদর্শ আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতাম। কখনও কখনও তাঁর কথা মনে করে আমি অশ্রু বিসর্জন করতাম।

উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাকে খুব খারাপ ছাত্র মনে করা হত না। সর্বদাই আমি শিক্ষকগণের স্নেহ লাভ করেছি। প্রতি বৎসর অভিভাবকদের কাছে ছাত্রের উন্নতি ও চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞান পত্র পাঠান হত। আমি কখনও নিন্দনীয় অভিজ্ঞান পত্র পাই নি। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মান উত্তীর্ণ হবার সময় আমি

পুরস্কারও পেয়েছিলাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠমান উত্তীর্ণ হবার সময় আমি যথাক্রমে চারটাকা ও দশটাকা করে ছাত্রবৃত্তি পাই। অবশ্য এই কৃতিত্বের জন্য আমার প্রতিভা অপেক্ষা সৌভাগ্যই অধিকতর দায়ী। কারণ এই ছাত্রবৃত্তি সকলের জন্য ছিল না। একমাত্র কাঠিয়াওয়াড়ের সোরাঠ বিভাগ থেকে আগত ছাত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি সংরক্ষিত ছিল। সেকালে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছাত্রের ক্লাসে ক'জনই বা সোরাঠের ছাত্র থাকত?

আমার মনে পড়ে যে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। পুরস্কার বা ছাত্রবৃত্তি পেলে আমি বিস্মিত হতাম। তবে চরিত্রের শুচিতা সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত সতর্ক থাকতাম। এবিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেই আমার চোখে অশ্রুবন্যা বইত। আমি যদি কোন ভুল করতাম বা শিক্ষক মহাশয় যদি কখনও মনে করতেন যে আমি ভুল করেছি এবং তার ফলে যদি আমাকে বকতেন তাহলে আমার পক্ষে তা অসহ্য মনে হত। একবার আমি মার খেয়েছিলাম মনে পড়ে। শাস্তির জন্য আমার মনে তেমন কোন দুঃখ হয় নি, দুঃখ হয়েছিল এই কথা ভেবে যে আমাকে শাস্তি পাবার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে। আমি ভীষণভাবে কেঁদেছিলাম। এ বোধ হয় তখনকার ঘটনা যখন আমি প্রথম বা দ্বিতীয় মানের ছাত্র। সপ্তম মানে পড়ার সময় এই জাতীয় আর একটি ঘটনা ঘটে। তখন দোরাবজী এডুলজী জিমি আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপ্রেমী, কুশলী পরিচালক এবং উত্তম শিক্ষক হওয়ায় ছাত্র-

মহলে খুবই সমাদৃত ছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য তিনি শরীরচর্চা এবং ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এ দুই-ই আমার মনোমত ছিল না। বাধ্যতামূলক করার পূর্বে আমি কদাচ কোন রকমের ব্যায়াম, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করি নি। আমার লাজুক স্বভাব এইরূপ নিঃসঙ্গ বৃত্তির জন্য অনেকটা দায়ী এবং এখন আমি আমার ঐ রকম স্বভাবের ত্রুটি উপলব্ধি করতে পারি। আমার মনে তখন এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে শিক্ষার সঙ্গে ব্যায়ামের কোন সম্বন্ধ নেই। তবে একথাও বলব যে ব্যায়াম না করা সত্বেও আমার স্বাস্থ্য এমন কিছু খারাপ ছিল না। এর কারণ হচ্ছে এই যে আমি উন্মুক্ত বায়ুতে বেড়ানর উপকারিতার কথা বই-এ পড়েছিলাম এবং সে পরামর্শ ভাল লাগায় হেঁটে বেড়ানর অভ্যাস করেছিলাম ও আজ পর্যন্ত সে অভ্যাস বজায় আছে। এইভাবে বেড়ানর জন্য আমার শরীর বেশ সুগঠিত ছিল।

পিতার সেবা-শুশ্রূষা করার তীব্র ইচ্ছা থাকায় আমি ব্যায়ামের জন্য সময় দিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। বিদ্যালয়ের ছুটি হওয়া মাত্র আমি গৃহে উপনীত হয়ে তাঁর সেবা আরম্ভ করতাম। বাধ্যতামূলক ব্যায়ামের নির্দেশ প্রত্যক্ষ ভাবে আমার পিতার সেবার বাধক হল। শ্রীযুক্ত জিমিকে আমি অনুরোধ জানালাম যে তিনি যেন আমাকে পিতার সেবা করতে দেবার জন্য ব্যায়াম থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি কিন্তু আমার আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। সকালে স্কুলের সময় এবং শনিবারে বৈকাল চারটার সময় আমাদের ব্যায়াম করার জন্য বিদ্যালয়ে যাবার কথা ছিল। আমার কাছে ঘড়ি ছিল

না এবং মেঘ করায় আমি ঠিক সময় আন্দাজ করতে পারি নি। আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবার পূর্বে অন্যান্য ছাত্ররা বাড়ী চলে গিয়েছিল। পরদিন শ্রীযুক্ত জিমি হাজিরা খাতা পরিদর্শন করার সময় দেখলেন যে আমি পূর্বদিন অনুপস্থিত ছিলাম। অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় যা ঘটেছিল আমি তা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না এবং সঠিক পরিমাণ আমার মনে পড়ছে না, আমাকে এক আনা অথবা দুই আনা জরিমানা দিতে বললেন।

মিথ্যা কথা বলার জন্য আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে! এ কথা ভেবে আমি গভীরভাবে আহত হলাম। কেমন করে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করব? কোন পথ দেখছিলাম না। বেদনায় আমি কেঁদে উঠলাম। আমি বুঝলাম যে সত্যপ্রেমীর সতর্ক ভাবে চলাফেরা করতে হয়। বিদ্যালয়ের জীবনে এই আমার প্রথম ও শেষ গাফিলতির নিদর্শন। আমার আবছা ভাবে মনে পড়ছে যে শেষ পর্যন্ত আমি জরিমানার পয়সা ফেরত পেয়েছিলাম। ব্যায়াম করা থেকেও অবশ্য পরে অব্যাহতি পেয়েছিলাম; কারণ স্বয়ং আমার পিতা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে লিখেছিলেন যে বিদ্যালয় ছুটির পর তিনি আমাকে বাড়ীতে চান।

তবে ব্যায়ামের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও আর একটি বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা করার ফল এখনও আমাকে ভুগতে হচ্ছে। জানি না কবে থেকে আমার মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হয় যে সুন্দর হস্তলিপি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

বিদ্যালয় জীবনের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমার বিবাহের জন্য এক বৎসর সময় নষ্ট হয় এবং আমাদের শিক্ষক মহাশয় ঐ ক্লাসটি ডিঙ্গিয়ে গিয়ে আমাকে এই লোকসান পুষিয়ে নেবার জন্য বলেন। সাধারণতঃ কঠিন পরিশ্রমী ছাত্রদের এ সুযোগ দেওয়া হত। সুতরাং তৃতীয় মানে আমি মাত্র ছয় মাসের জন্য পড়ি এবং গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ববর্তী পরীক্ষার পর আমাকে চতুর্থ মানে উত্তীর্ণ করা হয়। চতুর্থ মান থেকে অধিকাংশ বিষয় ইংরাজীতে পড়ান হত। আমার পক্ষে এ খুব কঠিন বোঝা হল। জ্যামিতি একটি নূতন বিষয় হল এবং আমি তা আদৌ বুঝতে পারতাম না। তার উপর ইংরাজীর মাধ্যম একে আরও কঠিন করে তুলল। শিক্ষক মহাশয় ভাল ভাবেই পড়াতেন; কিন্তু আমি তার অধ্যাপনা বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে আমি হতাশ হয়ে তৃতীয় মানে ফিরে যাবার কথা ভাবতাম। মনে হত দু' বছরের পড়া সামলান অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু এতে শুধু আমারই অসম্মান নয়, যে শিক্ষক মহাশয়ের আনুকূল্যে এ সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁরও অপযশ। কারণ তিনি আমার যোগ্যতার উপর ভরসা করে আমাকে এইভাবে উন্নীত করার সুপারিশ করেছিলেন। এই দ্বৈত অপযশের ভয় আমাকে ধরে রাখল। অবশ্য যখন বহু কষ্টে ইউক্লিডের ত্রয়োদশ উপপাদ্য পর্যন্ত উপনীত হলাম, তখন জ্যামিতির রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। যে বিষয়ে কেবল মানুষের সাধারণ যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন, তা কখনও কঠিন হতে পারে না। সেই থেকে জ্যামিতি আমার কাছে সরল এবং চিত্তাকর্ষক মনে হতে লাগল।

সংস্কৃত অবশ্য আরও কঠিন মনে হল। জ্যামিতিতে মুখস্ত করার কিছু ছিল না ; পক্ষান্তরে আমার মনে হত যে সংস্কৃতে সব কিছুই মুখস্ত বিদ্যার উপর নির্ভর। এই বিষয়টিও চতুর্থ মান থেকে আরম্ভ হয়। ষষ্ঠমানে উঠে আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। শিক্ষক মহাশয় কড়া লোক ছিলেন এবং আমার মনে হত যে তিনি যেন ছেলেদের উপর চাপ দিতে উৎসুক ছিলেন। এ ছাড়া সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষকদের মধ্যে এক প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। ফারসী শিক্ষক মহাশয় একটু নরম প্রকৃতির ছিলেন। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত যে ফারসী শেখা অত্যন্ত সহজ এবং ফারসী শিক্ষক মহাশয় খুব ভাল ও ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। এই "সহজের" প্রলোভনে একদিন আমি ফারসী ক্লাশে গিয়ে বসলাম। সংস্কৃতের শিক্ষক মহাশয় এতে ব্যথিত হলেন। তিনি আমাকে তাঁর পাশে ডেকে বললেন, "তুমি যে বৈষ্ণব পিতার সন্তান একথা ভুলছ কি করে? তোমার কুলধর্মের ভাষা তুমি শিখবে না? কোন অসুবিধা হলে আমার কাছে আস না কেন? আমার যতটুকু ক্ষমতা তা নিঃশেষ করে তোমাকে আমি সংস্কৃত শেখাতে চাই। ক্রমশঃ এতে গভীর চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহ পাবে। নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। আজ থেকে আবার সংস্কৃত ক্লাশে বসবে।"

তাঁর এই সদয় ব্যবহারে আমি লজ্জিত হলাম। শিক্ষক মহাশয়ের স্নেহ আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। তখন যেটুকু সংস্কৃত শিখেছিলাম, তা না শিখলে আমার পক্ষে আমাদের ধর্মগ্রন্থ সমূহে রস পাওয়া কঠিন হত। বস্তুতঃ সংস্কৃতে আরও পারঙ্গম

হতে পারি নি বলে এখন আমার দুঃখ হয়। কারণ পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে প্রতিটি হিন্দু বালক বালিকার সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

: ৩ :

বিবাহ

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে তের বছর বয়সে আমার বিবাহ হয়েছিল। আমার তত্ত্বাবধানে যে সব বালক বালিকা রয়েছে, তাদের দিকে চেয়ে আমি যখন আমার নিজের বিবাহের কথা চিন্তা করি, তখন আমার নিজেরই উপর দয়া হয় এবং এরা আমার অবস্থা এড়াতে পেরেছে বলে এদের সংবর্ধনা জানাই। এই জাতীয় বাল্য-বিবাহের সপক্ষে আমি কোনরকম নৈতিক যুক্তি খুঁজে পাই না।

আমার কাছে বিবাহের অর্থ ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ, বাদ্য-সম্ভার, আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা, মুখরোচক খাদ্য ও খেলার সঙ্গী একটি অপরিচিতা বালিকার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। ক্রমশঃ আমরা পরস্পরকে জানতে লাগলাম ও স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলা আরম্ভ করলাম। আমরা একই বয়সের ছিলাম। কিন্তু স্বামীত্বের মর্যাদায় আসীন হতে আমার বেশী দেরী হল না।

আমার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে স্ত্রীকে কোথাও যেতে দেওয়া আমি পছন্দ করতাম না। কস্তুরবা কিন্তু এ জাতীয় বিধি নিষেধ মানার পাত্রী ছিলেন না। ইচ্ছামত যেখানে খুশী যাওয়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়াল। আমি যতই রাশ টানতে যাই, তিনি ততই

স্বাধীন আচরণ করেন এবং ফলে আমিও ততই ক্রুদ্ধ হই। সুতরাং আমাদের ভিতব কথা বন্ধ হওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এখন আমার মনে হয় যে কস্তুরবা আমাকর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ না মেনে মোটেই কোন দোষ করেন নি। কোন নির্দোষ বালিকা কি করে মন্দিরে যাওয়া বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বন্ধ করবে? আমার যদি তাঁকে বাধা দেবার অধিকার থেকে থাকে, তবে তাঁরও কি আমার উপর অনুরূপ অধিকার নেই? আজ এ সব বুঝতে পারছি। তখন কিন্তু আমি পূর্ণোদ্যমে আমার স্বামীত্বের কর্তৃত্ব চালাতাম।

তবে পাঠক যেন একথা না ভাবেন যে আমাদের জীবন নিত্য বিবাদময় ছিল। কারণ আমার যাবতীয় কঠোরতা প্রেমভিত্তিক ছিল। আমি আমার স্ত্রীকে আদর্শ পত্নী করতে চাইতাম। তাঁর জীবন পবিত্র করে গড়ে তোলা, আমি যা শিখি তাঁকে তা শেখান এবং তাঁর জীবনকে আমার জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে একাত্ম করা আমার বাসনা ছিল।

আমার মনে হয় না যে কস্তুরবার মনে একরকম কোন ইচ্ছা ছিল। তিনি লিখতে পড়তে জানতেন না। স্বভাবতই তিনি অনাড়ম্বর, স্বাধীন চেতা, গম্ভীর এবং অন্ততঃ আমার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে লাজুক স্বভাবের ছিলেন। নিজ অজ্ঞতার জন্য তাঁর ভিতর অধৈর্য ভাব ছিল না এবং আমার পড়াশুনা দেখে তাঁর কখনও পড়াশুনার ইচ্ছা হত বলে আমার মনে পড়ে না।

: ৪ :

মারাত্মক বন্ধুত্ব

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে আমার যে সব বন্ধু জুটেছিল, তাদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলা যায়। আমি যদিও বন্ধুদের সাহচর্য দিতাম, তবু একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। আমি দ্বিতীয় জনের সঙ্গেও হৃদ্যতা করায় প্রথমোক্ত বন্ধুটি আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। এই দ্বিতীয় জনের সঙ্গে বন্ধুত্বকে আমি জীবন-নাট্যের এক দুঃখজনক অধ্যায় মনে করি। এ বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। আমি সংস্কারের মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে এ সখ্যতা বন্ধন গড়ে তুলেছিলাম।

এই বন্ধুটি প্রথমে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গী ছিল। ওরা সহপাঠীও ছিল। আমি তার দুর্বলতার কথা জানতাম; কিন্তু তবু তাকে বিশ্বস্ত মিত্র রূপে মনে করতাম। আমার মা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্ত্রী আমাকে সতর্ক করে দেন যে আমি অসৎ সংসর্গে পড়েছি। স্ত্রীর সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করার মতো বিনয় আমার স্বভাবে ছিল না। তবে মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস আমার হত না। তবু আমি নিম্ন প্রকারের যুক্তি-জাল বিস্তার করে তাঁদের বললাম, "আমি জানি যে ওর ভিতর অনেক দুর্বলতা আছে; কিন্তু আপনারা ওর সদ্‌গুণাবলীর সঙ্গেও পরিচিত নন। ও আমাকে কুপথে চালিত করতে পারবে না, কারণ ওকে সংশোধন করার জন্যই ওর সঙ্গে আমার মেশা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজ আচরণ পরিবর্তন

করলে ও চমৎকার মানুষ হবে। আমি আপনাদের আমার জন্য দুশ্চিন্তা না করতে অনুরোধ করি।”

আমার মনে হয় না যে তাঁরা এতে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তবে তাঁরা আমার কৈফিয়ৎ স্বীকার করে নিয়ে আমাকে নিজের মতে চলতে দিয়েছিলেন।

প্রথমে আমি যখন এই বন্ধুটির সঙ্গে পরিচিত হই, তখন সমগ্র রাজকোট জুড়ে “সংস্কারের” প্রবল বন্যা বইছিল। বন্ধুটি আমাকে খবর দিল যে আমাদের বহু শিক্ষক গোপনে মদ ও মাংস খাওয়া ধরেছেন। এ ছাড়া সে রাজকোটের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম করে জানাল যে তাঁরাও এ দলে আছেন। তা ছাড়া কিছুসংখ্যক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রও এর মধ্যে ছিল বলে শুনলাম।

আমি বিস্মিত এবং ব্যথিত হলাম। বন্ধুটিকে আমি এ সবের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম এবং সে ব্যাখা করে বলল, “মাংস না খাওয়ার জন্য, আমাদের জাতি দুর্বল। ইংরাজরা মাংস খায় বলে আমাদের প্রভু। আমি কত শক্তিশালী এবং কি রকম ছুটতে পারি তা তো দেখ্ছ। এর কারণ আমি মাংসাহারী। মাংসাহারীদের ফোড়া ইত্যাদি হয় না এবং কদাচিৎ হলেও অতি সহজে তা ভাল হয়ে যায়। আমাদের যে সব শিক্ষক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাংস আহার করেন, তাঁরা তো আর মূর্খ নন। তাঁরা এর গুণপনা নিশ্চয়ই জানেন। তোমারও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। চেষ্টার তুল্য সাধনা নেই। চেষ্টা করে দেখ কী শক্তি পাও।’

মাংস খাওয়ার সপক্ষে এই সব যুক্তি-জাল একসঙ্গেই আমার উপর বর্ষিত হয় নি। আমাকে দীক্ষিত করার জন্য আমার বন্ধু প্রায়ই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ এবং বিস্তারিত আলোচনা করত, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি তারই সংক্ষিপ্ত সার। আমার অগ্রজ ইতিপূর্বেই ধরাশায়ী হয়েছিলেন। তিনি তাই আমার বন্ধুর যুক্তি সমর্থন করতেন। আমার এই ভ্রাতা ও বন্ধুটির পাশে আমাকে সত্য সত্যই রুগ্ন দেখাত। এরা উভয়েই আমার তুলনায় সবল, মজবুত দেহশ্রীসম্পন্ন ও সাহসী ছিল। বন্ধুটির বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যকলাপ আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহুদূর দৌড়াতে পারত। হাই জাম্প ও লং জাম্পে সে ছিল ওস্তাদ। যত দৈহিক নির্যাতনই তার উপর হক না কেন, সে অম্লান বদনে তা সহ্য করত। বন্ধুটি প্রায়ই তার জীবনের কীর্তি কলাপ আমার সম্মুখে প্রদর্শন করত এবং নিজের ভিতর যে সব গুণেব অভাব, অপরের ভিতর তার নিদর্শন পেলে মানুষ সম্মোহিত হয়ে যায়, আমিও তেমনি তার গুণগ্রাম দৃষ্টে মোহিত হলাম। এর পরেই তার মত হবার তীব্র বাসনা জাগল। আমি লাফাতে বা দৌড়াতে পারতাম না বললেই চলে। ভাবলাম, আমিও তাহলে কেন ওর মত বলশালী হব না।

এছাড়া আমি ভীরু স্বভাবেরও ছিলাম। চোর, ভূত এবং সাপের ভয়ে আমি সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতাম। রাত্রে ঘরের বাইরে যাবার সাহস আমার ছিল না। অন্ধকার দেখলে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠতাম। অন্ধকারে থাকা আমার পক্ষে এক অসম্ভব

ব্যাপার ছিল ; কারণ অন্ধকার হলেই আমার মনে হত যে এক দিক থেকে ভূত, অন্যদিক থেকে চোর ও আর এক দিক থেকে সাপ এসে আমার উপর চড়াও হচ্ছে। সুতরাং ঘরে বাতি না জ্বেলে শোয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার বন্ধুটি আমার এসব দুর্বলতার কথা জানত। গর্ব ভরে আমাকে বলত—সে জীবন্ত সাপ ধরতে পারে, চোরদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এবং ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না।

এ সবের প্রভাব আমার উপর অবশ্যই পড়ত। নিজেকে আমি পরাজিত বোধ করতাম। আমি ক্রমশঃ বিশ্বাস করতে লাগলাম যে মাংস খাওয়া ভাল, এর ফলে আমি বলবান ও সাহসী হব এবং সমগ্র দেশ মাংসাহারী হলেই ইংরেজদের বিতাড়িত করা সম্ভবপর।

অতএব এই নবীন তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট হল। এ কার্য গোপনে সমাধা করতে হবে ; কারণ আমার পিতামাতা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন ও আমি একান্তভাবে তাঁদের অনুগত ছিলাম। আমি একথা বলব না যে মাংসাহারের ফলে পিতামাতাকে যে প্রতারণা করা হবে, এ কথা তখন আমি জানতাম না। কিন্তু সংস্কার সাধন করার জন্য আমার মনে দৃঢ় সঙ্কল্পের উদয় হয়েছিল। মুখরোচক কিছু খাবার প্রশ্ন আমার কাছে ছিল না। মাংসের যে বিশেষ একটা স্বাদ আছে—এ কথা তখন আমি জানতাম না। আমি বলবান ও সাহসী হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম এবং দেশবাসীও এই রকম হক—তাই চাইতাম। "সংস্কার" সাধন করার উদগ্র বাসনা

আমাকে অন্ধ করে ফেলেছিল। গোপনে কার্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার পর নিজের মনকে আমি এই বলে প্রবোধ দিলাম যে শুধু পিতা-মাতার কাছ থেকে গোপন করার কারণেই এ জাতীয় মহান কার্যকে সত্য-বিচ্যুতি আখ্যা দেওয়া যায় না।

নির্ধারিত দিন এল। নির্জন স্থানের খোঁজে আমরা নদীর ধারে গেলাম এবং জীবনে সেই প্রথম আমি মাংস দেখলাম। এর সঙ্গে পাঁউরুটিও ছিল। দুটির কোনটিই আমার কাছে উপাদেয় মনে হল না। পাঁঠার মাংস চামড়ার মত মনে হচ্ছিল। এক কথায় আমি ওসব মুখেও দিতে পারলাম না। আমার গা ঘুলিয়ে উঠল এবং আহার পর্বের ইতি ঐখানেই করলাম।

অতি কষ্টে সেদিনকার রাত্রি অতিবাহিত হল। ভীষণ এক স্বপ্নে আমি বার বার শিউরে উঠতে লাগলাম। চোখের পাতা বুজলেই মনে হত যেন একটা জীবন্ত পাঁঠা আমার পেটের মধ্যে চীৎকার করছে। আতঙ্কে আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং কৃতকর্মের জন্য ভীষণ অনুশোচনা বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু তারপরই নিজেকে আবার আশ্বাস দিলাম যে মাংস খাওয়াটা একটা কর্তব্য এবং তাই অধিকতর উৎফুল্ল হলাম।

বন্ধুটি এত সহজে নিরস্ত হবার পাত্র ছিল না। সে এবার নানাবিধ সুস্বাদু প্রক্রিয়ায় মাংস রাঁধা আরম্ভ করল। খাবার জন্য এখন আর নদীতীরে নিরালা স্থান অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হল না। আমার বন্ধুটি রাজ সরকারের একটি বাটীর প্রধান পাচকের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তত্রস্থ ভোজন গৃহে টেবিল চেয়ারের উপর খাবার বন্দোবস্ত করেছিল।

ধীরে ধীরে পাঁউরুটির উপর বিতৃষ্ণা কেটে গেল এবং পাঁঠার জন্য করুণাও মন থেকে লোপ পেল। মাংসের আনুসঙ্গিক আহার্য এবং এমন কি মাংসও আমার ভাল লাগতে লাগল। প্রায় বছর খানেক এই রকম চলল। তবে সর্ব সাকুল্যে বার ছয়েকের বেশী আমরা মাংস খাই নি। "এই সংস্কারের" ব্যয় নির্বাহ করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার ছিল না। অতএব আমার বন্ধুটিকে প্রত্যেকবার অর্থ সংগ্রহ করতে হত। কোথা থেকে যে সে টাকা পেত, আমি তার খবর রাখতাম না। তবে সে টাকা জুটিয়েই ফেলত; কারণ আমাকে মাংসাহারী করার জন্য সে উঠে পড়ে লেগেছিল। তবে তার সঙ্গতিও নিশ্চয়ই সীমিত ছিল এবং তাই আমাদের এই সব ভোজের সংখ্যা ছিল অল্প। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এ অনুষ্ঠিত হত।

এই সব গোপন ভোজে সম্মিলিত হলেই আমি আর ঘরে খেতে পারতাম না। মা অভ্যাস মত খেতে ডাকতেন এবং আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তার কারণ জানতে চাইতেন। জবাবে আমি বলতাম, "আজ আমার খিদে নেই; বোধ হয় হজমের গোলমাল হয়েছে।" আমি জানতাম যে মা-বাবার কাছে যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় যে আমি আমিষাহারী হয়েছি, তাহলে তাঁরা প্রচণ্ড আঘাত পাবেন। এই কথা মনে এলে মাঝে মাঝে বড়ই অস্বস্তি বোধ হত।

তাই আমি মনে মনে স্থির করলাম, "মাংস খাওয়া এবং দেশবাসীর আহার্য বস্তুর সংস্কার সাধন করা অপরিহার্য হলেও মা-বাবাকে প্রতারণা করা ও তাঁদের কাছে মিথ্যা বলা মাংস না

খাওয়ার চেয়েও ভয়ংকর অন্যায়। সুতরাং তাঁদের জীবিত কালে মাংসাহার বর্জন করা উচিত। তাঁদের অবর্তমানে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা পেলে খোলাখুলি ভাবেই আমি মাংস খাব; কিন্তু সেই সময় না আসা পর্যন্ত মাংস খাওয়া ছেড়ে দেব।"

আমার এ সিদ্ধান্তের কথা সেই বন্ধুটিকে জানিয়ে দিলাম এবং তারপর আমি আর কখনও মাংস খাই নি।

: ৫ :

চুরি

এই মাংসাহার-পর্ব চলাকালীন আমার মনের সমস্ত কথা খুলে বলা হয় নি। আমার বিবাহের কিছু পূর্বে বা সামান্য পর থেকেই এই কালের সূত্রপাত হয়।

আমাদের জনৈক আত্মীয় ও আমি ধূমপানের অভ্যাস করলাম। ধূমপানের পিছনে কোন মহত্ব আছে বা বিড়ির গন্ধ আমাদের ভাল লাগত বলে আমরা এ অভ্যাস শুরু কবি নি। মুখ দিয়ে ধূম্রজাল উদ্‌গীরণ করার মধ্যে আমরা বেশ একটা গৌরবমণ্ডিত তৃপ্তি বোধ করতাম। আমার কাকা ধূম্রপায়ী ছিলেন। আমরা যখন তাঁকে ধূমপানরত অবস্থায় দেখতাম তখন আমাদেরও তাঁর অনুকরণ করার ইচ্ছা হত। কিন্তু আমাদের হাতে পয়সা থাকত না। আমরা তাই খুল্লতাত মহাশয় কর্তৃক পরিত্যক্ত বিড়ির দগ্ধাবশেষ চুরি করা আরম্ভ করলাম।

তবে সর্বদা বিড়ির টুকরো পাওয়া যেত না এবং এর থেকে

তেমন ধোঁয়া বেরুতো না। সুতরাং আমরা ভৃত্যদের পকেট থেকে পয়সা চুরি করে বিড়ি কিনতে লাগলাম। সমস্যা দাঁড়াল চোরাই মাল রাখার স্থান নিয়ে। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে বিড়ি খাওয়া চলে না। কয়েক সপ্তাহ আমরা চুরি করা পয়সা দিয়ে কাজ চালালাম। ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম যে কোন এক ফুলের বোঁটা দিয়ে বিড়িব মত ধূমপান করা যায়। সেগুলি সংগ্রহ করে আমরা ধূম্রপান আরম্ভ করলাম।

কিন্তু এ সব করে আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি হচ্ছিল না। বড় করুণভাবে আমরা স্বাধীনতার অভাব বোধ করছিলাম। গুরুজনদের অনুমতি ব্যতীত আমরা কিছুই করতে পারব না—এ কথা ভাবতেও অসহ্য লাগছিল। অবশেষে জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল এবং আমরা আত্মহত্যা করা স্থির করলাম।

কিন্তু আত্মহত্যা করব কি করে? বিষ পাব কোথায়? শুনেছিলাম ধুতুরা ফুল মারাত্মক বিষ। জঙ্গলে গিয়ে আমরা এ বীজ সংগ্রহ করে আনলাম। সন্ধ্যাকাল আত্মহত্যার প্রশস্ত সময় বলে বিবেচিত হল। আমরা কেদারনাথজীর মন্দিরে গিয়ে পূজোর প্রদীপে ঘি দিলাম এবং দেবদর্শন করলাম। তারপর একটি নির্জন স্থান খুঁজে বার করলাম। কিন্তু ঠিক সময়ে আর সাহস এল না। যদি তাড়াতাড়ি না মরি? তাছাড়া আত্মহত্যা করে লাভই বা কি? তার চেয়ে খর্বিত স্বাধীনতা বরদাস্ত করাই ভাল। তবে ইতিমধ্যে আমরা দুই তিনটি বীজ গলাধঃকরণ করেছিলাম। আর বেশী বীজ খাবার সাহস হল না। আমাদের কারও আর মরার ইচ্ছা রইল না। আমরা তাই মনকে শান্ত করার জন্য

ও আত্মহত্যার চিন্তা বিসর্জন দেবার জন্য রামমন্দিরে যাওয়া স্থির করলাম।

বুঝতে পারলাম যে আত্মহত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়। আত্মহত্যার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আমাদের দুজনকে ধূমপান ও সেই কার্য সাধনের জন্য ভৃত্যের পয়সা অপহরণ করা ছাড়াল।

বড় হবার পর আর আমি কোন দিন ধূমপান করার ইচ্ছা বোধ করি নি এবং ধূম্রপানের অভ্যাসকে সর্বদা বর্বরতা, নোংরামি ও ক্ষতিকর বিবেচনা করেছি। সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী কেন যে ধূমপান করতে চায়, তা আমি কখনও বুঝতে পারি নি। ধূমপান নিরত যাত্রীতে বোঝাই রেলের কামরায় আমি সফর করতে পারি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

তবে এইবারকার চুরির চেয়েও ভীষণতর এক চৌর্যাপরাধ আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বার-তের বছর বা সম্ভবতঃ তার চেয়েও অল্প বয়সে আমি পয়সা চুরি করেছিলাম। দ্বিতীয় বার পনর বৎসর বয়সে চুরি করেছিলাম। এবার আমার মাংসাহারী ভ্রাতার তাগা থেকে কিছুটা সোনা চুরি করেছিলাম। এই ভাইএর প্রায় পঁচিশ টাকার মত ধার হয়ে গিয়েছিল। তার হাতে সোনার একটা নিরেট তাগা ছিল। তার থেকে এক টুকরো সোনা কেটে নেওয়া খুব কঠিন কাজ হল না।

যা-ই হক এই ভাবে ধার তো শোধ হল। তবে এ ব্যাপরটা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। আমি ভবিষ্যতে আর চুরি না করার সংকল্প করলাম। এ ছাড়া বাবার কাছে নিজের দোষ স্বীকার করা স্থির করলাম। কিন্তু তাঁর কাছে মুখ ফুটে কিছু

বলার সাহস হল না। বাবা মারবেন—এ ভয় ছিল না। তিনি আমাদের কাউকে কখনও মেরেছেন বলে মনে পড়ে না। আমার দরুণ তিনি যে বেদনা পাবেন, আমি তার জন্য ভয় পাচ্ছিলাম। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম যে ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে ; সব কথা পরিষ্কারভাবে স্বীকার না করলে আমার মন শান্ত হবে না।

অবশেষে আমি বাবার কাছে লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি করে তাঁর ক্ষমা যাচ্ঞা করা স্থির করলাম। এক টুকরো কাগজে সব কথা লিখে আমি স্বয়ং সেই কাগজ তাঁর হাতে দিলাম। আমার স্বীকারোক্তিতে আমি শুধু নিজের দোষ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হলাম না। কৃতকর্মের জন্য আমি যথোচিত শাস্তি চাইলাম এবং সর্বশেষে তাঁকে অনুরোধ জানালাম যে তিনি যেন আমার দোষে নিজেকে না সাজা দেন। ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি না করার সঙ্কল্পের কথাও ব্যক্ত করলাম। স্বীকারোক্তি বাবার হাতে দেবার সময় আমি কাঁপছিলাম। তিনি তখন শয্যাশায়ী ছিলেন। একটি চৌকির উপর তিনি শুয়েছিলেন। স্বীকারোক্তি তাঁর হাতে দিয়ে আমি চৌকির অপর দিকে বসে পড়লাম।

তিনি সেটির আগাগোড়া পড়লেন এবং পড়তে পড়তে তাঁর দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে কাগজখানা ভিজিয়ে দিল। চিন্তা করার জন্য এক মুহূর্ত তিনি চোখের পাতা বন্ধ করলেন এবং তারপর পত্রটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন। পড়ার জন্য তিনি উঠে বসেছিলেন। আবার তিনি শুয়ে পড়লেন। আমিও কাঁদছিলাম। আমি আমার বাবার দুঃখ বুঝতে পারছিলাম। আমি যদি শিল্পী হতাম তবে আজ সমস্ত ঘটনাটিকে চিত্রিত করতে

পারতাম। আজও আমার মনে সে দৃশ্য সেদিনকার মতই উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ভালবাসার সেই অশ্রু আমার হৃদয় শুদ্ধ করল এবং তার প্রবাহে আমার পাপ ধুয়ে গেল। ঐ রকম ভালবাসার স্বাদ যে পেয়েছে, মাত্র সে-ই জানে যে এ কী জিনিস।

এইভাবে ক্ষমা করা আমার বাবার স্বভাব ছিল না। আমি ভেবেছিলাম তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর শব্দ প্রয়োগ করবেন এবং নিজের মাথা কুটবেন। কিন্তু তিনি অদ্ভুত রকমের শান্ত রইলেন। আমার বিশ্বাস এর কারণ হচ্ছে আমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। যোগ্য ব্যক্তির কাছে যদি স্পষ্ট ভাষায় অন্যায় স্বীকার করে আর কখনও তা না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহলে তাকে অনুতাপ প্রকাশের শুদ্ধতম রূপ বলে আখ্যা দিতে হবে। আমি জানি যে আমার স্বীকারোক্তি আমার বাবাকে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করে এবং এর ফলে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

: ৬ :

পিতার অসুস্থতা ও মৃত্যু

এবার আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার বয়স ষোল বৎসর। পূর্বেই বলেছি যে আমার বাবা শয্যাশায়ী ছিলেন। আমার মা, বাড়ীর একজন পুরাতন ভৃত্য এবং আমি তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতাম। আমার কাজ ছিল কতকটা হাসপাতালের

সেবিকাদের মত। আমি তাঁর ঘা ধুইয়ে বেঁধে দিতাম এবং তাঁকে ওষুধ খাওয়াতাম। প্রতিরাত্রে আমি তাঁর পা টিপে দিতাম এবং তাঁর আদেশ পেলে অথবা তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তবে শুতে যেতাম। এই সব সেবা করতে আমি ভালবাসতাম। কখনও এ কার্যে অবহেলা করেছি এমন মনে পড়ে না। শৌচ ও আহারাদির সময় ছাড়া প্রত্যহ যে সময় পেতাম স্কুলে যাওয়া এবং বাবার সেবা করা—এই কার্যে নিয়োজিত হত। বাবা আদেশ করলে অথবা তাঁর শরীর বেশ ভাল থাকলে আমি সন্ধ্যাবেলায় একটু বেড়াতে যেতাম।

সেই ভয়ংকর রাত্রি এল। রাত তখন সাড়ে দশটা কি এগারটা হবে। আমি বাবার পা টিপছিলাম। আমার কাকা এসে আমার কাছ থেকে সে কাজের ভার নিয়ে নিলেন। আমি খুশি হয়ে শুতে গেলাম। এর পাঁচ-ছয় মিনিট পরেই চাকরটি এসে আমার শয়ন কক্ষের দরজায় করাঘাত করতে লাগল। আমি চমকে উঠে পড়লাম। সে বলল, "উঠে পড়, বাবার শরীর খুব খারাপ"। আমি অবশ্য জানতাম যে তিনি খুব অসুস্থ। তাই এ অবস্থায় "শরীর খুব খারাপ" বললে কি বোঝায় তা অনুমান করতে পারছিলাম। আমি বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠলাম।

"কি হয়েছে? আমাকে খুলে বল।"

"বাবা আর নেই!"

সুতরাং সব শেষ! আমার খুব দুঃখ হল যে বাবার শেষ সময়ে আমি তাঁর কাছে থাকতে পারি নি।

: ৭ :

ধর্মের অস্পষ্ট উপলব্ধি

পূর্বেই বলেছি যে আমার মধ্যে ভূত-প্রেতের ভয় প্রবল ভাবে ছিল। এই ভয় দূর করার জন্য আমার দাই রম্ভা একটি উপায়ের সন্ধান দিল। সে আমাকে 'রাম নাম' জপ করতে বলল। অবশ্য রম্ভার ওষুধের চেয়ে স্বয়ং রম্ভার উপরই আমার বিশ্বাস ছিল বেশী। সুতরাং খুব অল্প বয়স থেকেই ভূত-প্রেতের ভয় তাড়াবার জন্য আমি রাম নাম জপ করা শুরু করেছিলাম। এ ব্যাপার অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

তবে ছেলে বেলায় যে ভাল বীজ বপন করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ যায় নি। আমি মনে করি যে রম্ভার মত এক মহীয়সী মহিলার কাছ থেকে পেয়েছি বলেই আজ 'রাম নাম' আমার কাছে এক অব্যর্থ ঔষধ।

বাবা অসুস্থাবস্থায় কিছুদিন পোরবন্দরে ছিলেন। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তিনি রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করতেন। কথক ঠাকুর খুব রামভক্ত ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুললিত। রামায়ণের চরণগুলি আবৃত্তি করে তিনি তার ব্যাখ্যা করতেন। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে একেবারে ভুলে যেতেন এবং বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকেও সেই প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। সে সময় আমার বয়স তের বছরের বেশী ছিল না; তবে আমার বেশ মনে আছে যে আমি তাঁর কথকতা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম। এর থেকে রামায়ণের প্রতি আমার গভীর ভক্তির উদয় হয়। আজ আমি তুলসীদাসের রামায়ণকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ মনে করি।

রাজকোটে আমি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে শিখলাম। কারণ, আমার বাবা-মা হাবেলীতে (বিষ্ণু মন্দির) যাবার সঙ্গে সঙ্গে শিবমন্দির এবং রামমন্দিরেও যেতেন এবং আমাদের মত ছোটদেরও ঐসব মন্দিরে নিয়ে যেতেন। প্রায়ই জৈন সাধুরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং প্রচলিত প্রথার উলঙ্ঘন করে আমাদের মত জৈনসমাজ বহির্ভূত পরিবারে অন্ন গ্রহণ করতেন। তাঁরা আমার বাবার সঙ্গে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

এ ছাড়া তাঁর মুসলমান ও পার্শী বন্ধুও ছিল। তাঁরা তাঁদের ধর্মমত নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং বাবা গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কথা শুনতেন। বাবার সেবায় ব্যাপৃত থাকার জন্য আমি মাঝে মাঝে এই সব আলোচনা শুনতে পেতাম। এই সব কারণে আমি সকল ধর্মের প্রতি উদার হবার শিক্ষা পেয়েছিলাম।

এই সময় কেবল খ্রীষ্টধর্মের পরিচয় পাবার সুযোগ হয় নি। মনে মনে আমার এই ধর্মের প্রতি কেমন একটা বিরাগ জন্মেছিল। অবশ্য এর একটা কারণও ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা সে সময় হাই স্কুলের কাছে একটি মোড়ে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। আমি এটা বরদাস্ত করতে পারতাম না। প্রায় ঐ সময়ই আমি একজন খ্যাতনামা হিন্দুর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার খবর শুনেছিলাম। শহরে সে সময় এই কথা সকলের মুখে মুখে আলোচিত হত যে দীক্ষা নেবার সময় তাঁকে গো-মাংস ও মদ্য

গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তাঁকে তাঁর স্বদেশীয় পোষাক বর্জন করে হ্যাট কোটে শোভিত ইউরোপীয়ের বেশ ধারণ করতে হয়েছিল। আমি একথাও শুনলাম যে নবদীক্ষিত ভদ্রলোক ইতিমধ্যে তাঁর পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ও তাঁর স্বদেশবাসীর আচার ব্যবহারের নিন্দা করা আরম্ভ করেছেন। এই সব কারণের জন্য আমি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ি।

তবে আমি পরধর্মসহিষ্ণু হয়েছিলাম বলার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরে আমার জীবন্ত বিশ্বাস ছিল। তবে একটা বিষয় আমার অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তাব কবেছিল। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে সব ধর্মের মূলে আছে নৈতিকতা এবং সকল নীতির সার হচ্ছে সত্য।

এ ছাড়া একটি গুজরাতী কবিতা আমার হৃদয় মন জুড়ে বসল। কবিতাটির মূল বক্তব্য ছিল পুণ্য কর্মের দ্বারা পাপের প্রতিরোধ কর। এই নীতি আমার ধ্রুবতারা হল। এই ভাব-ধারা এমন ভাবে আমাকে পেয়ে বসল যে এ নিয়ে আমি অসংখ্য পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলাম। নীচে সেই চমৎকার (অবশ্য আমার পক্ষে) পঙতি কয়টি উদ্ধৃত করছি ঃ

যে তোমারে দিয়েছে তৃষ্ণার জল।
ক্ষুধা তার নিবারিতে দাও মিষ্টফল॥
সস্নেহ বচনে তোমা সম্ভাষে যে জন।
তাঁহারে প্রণতি কর দিয়া প্রাণ-মন॥
যে দিল তোমারে শুধু কাণা এক কড়ি।
দাও তার হস্তদ্বয় স্বর্ণ দিয়া ভরি॥

তোমার জীবন যদি করে কেউ ত্রাণ।
তুমি কি বধিতে পার আর কারও প্রাণ ?
সুবিজ্ঞ জনের সদা এই তো বিচার।
সামান্য সেবারে দেয় বহু পুরস্কার ॥
যথার্থ পুণ্যাত্মা ঠিক জানে এই কথা।
মানুষে মানুষে নাই কোন বিষমতা ॥
অতএব সাধুজন প্রসন্ন অন্তরে।
অন্যায়ের বিনিময়ে সদাচার করে ॥

: ৮ :

ইংলণ্ডের জন্য প্রস্তুতি

আমার গুরুজনদের অভিপ্রায় ছিল যে আমি স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হই। ভাওনগর এবং বোম্বাই উভয় জায়গাতে কলেজ ছিল। তবে ভাওনগরে খরচ কম বলে আমি সেখান থেকে শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হওয়া স্থির করলাম। ভর্তি হয়ে দেখলাম সেখানকার পড়াশুনা খুব কঠিন লাগছে। সুতরাং প্রথম কয় মাস পড়ার পর আমি ঘরে ফিরে এলাম।

মাভেজী দভে নামে একজন বিচক্ষণ ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ আমাদের পরিবাবের পুরাতন বন্ধু ও উপদেষ্টা স্থানীয় ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পরও আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। ছুটির দিনে তিনি আমাদের বাড়ী আসতেন। আমার মা ও দাদার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমার

পড়াশুনা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। আমি শ্যামলদাস কলেজে আছি দেখেই তিনি বললেন, "আজকাল সময় পাল্টে গেছে। উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে তোমাদের মধ্যে কেউ তোমাদের বাবার পদ পাবার আশা করতে পার না। এই ছেলেটি এখনও পড়াশুনা করছে বলে ও যাতে তোমাদের বাবার পদ পায়, তার জন্য তোমাদের সকলের ব্যবস্থা করা উচিত। বি. এ. পাশ করতে ওর চার বছর লাগবে এবং তারপর খুব বেশী হলে ষাট টাকা মাইনের কোন একটা চাকরী পাবে। দেওয়ান হবার যোগ্যতা এ পথে ওর হবে না। আর আমার ছেলের মত ও যদি আইন পড়তে যায়, তবে তাতে আরও বেশী সময় লাগবে এবং আইন পাশ করার পর দেখা যাবে ততদিনে দেওয়ানের পদের জন্য আরও বহু প্রার্থী জুটে গেছে। তার চেয়ে ওকে বরং ইংলণ্ডে পাঠাও। ঐ যে ব্যারিস্টার সেদিন বিলাত থেকে এলেন, তাঁর কথা ভেবে দেখ তো? তাঁর চাল চলন কেমন উঁচু দরের! একবার মুখের কথা খসালেই সে দেওয়ান হয়ে যায়। মোহনদাসকে তোমরা এই বছরই বিলাত পাঠাও। কেবলরামের ইংলণ্ডে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। সে মোহনদাসকে তাদের নামে পরিচয়-পত্র দিয়ে দেবে এবং তাহলে মোহনদাসের ওখানে আর কোন অসুবিধা হবে না।

যোশীজী (বৃদ্ধ মাভেজী দভেকে আমরা ঐ নামেই ডাকতাম) আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে পড়ার চেয়ে তুমি কি ইংলণ্ডে যাওয়া বেশী পছন্দ কর না?" এর চেয়ে আনন্দদায়ক ব্যাপার আমার কাছে আর কী-ই বা হতে পারত? এখানকার পড়াশুনা আমার বেশ কঠিন লাগছিল। তাই আমি এ প্রস্তাব

শুনেই একরকম লাফিয়ে উঠে বললাম যে, যত শীঘ্র আমাকে পাঠান যায়, ততই ভাল।

আমার দাদা মনে মনে খুব বিচলিত হচ্ছিলেন। বিলাত পাঠাবার টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন? আর আমার মত একজন অপরিণত বয়স্ক তরুণকে একা অত দূরদেশে ভরসা করে পাঠান কি সম্ভব? আমার মাও বড় চিন্তায় পড়লেন। আমাকে ছেড়ে থাকার কল্পনা তাঁর সুখকর বোধ হচ্ছিল না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নেওয়া শুরু করলেন। কে যেন তাঁকে বলেছিল যে ইংলণ্ডে প্রায়ই ছেলে হারায়। আর একজন খবর দিল যে সে দেশে গিয়ে সবাই মাংস খাওয়া আরম্ভ করে; আর একজন আবার আর এক কাঠি উপরে চড়ে তাঁকে জানাল যে সে দেশে মদ না খেয়ে থাকাই যায় না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "এ সবের কি ব্যবস্থা হবে?" আমি বললাম, "তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? আমি তোমার কাছে মিথ্যাচারী হব না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ওসব জিনিস আমি স্পর্শও করব না। এ রকম কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলে যোশীজী কি যাবার জন্য পরামর্শ দিতে পারতেন?"

তিনি বললেন, "তোমাকে তো বিশ্বাস করিই, তবে অত দূরদেশে কি করে ভরসা করা যায়? আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি যে করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমি বরং বেচারীজী স্বামীর মত নিই।"

বেচারীজী স্বামী গার্হস্থ্য জীবনে মোঢ় বেনে ছিলেন। পরে তিনি জৈন সাধু হয়েছিলেন। তিনিও যোশীজীর মত আমাদের পরিবারের

উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি আমার সহায়তা করলেন এবং বললেন, "ছেলেটি তিনটি শপথ গ্রহণ করুক এবং তারপর তাকে যেতে দেওয়া যেতে পারে।" আমি মদ্য, মাংস এবং নারীসংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার শপথ গ্রহণ করলাম। এরপর মা অনুমতি দিলেন।

আমাদের হাই স্কুলের তরফ থেকে আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানান হল। রাজকোটের কোন যুবকের পক্ষে ইংলণ্ড যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা নয়। আমি কয়েক ছত্র ধন্যবাদসূচক কথা লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবে তা আর আমার পড়া হয়ে উঠল না। মনে পড়ে পড়তে উঠেই কেমন ভীষণ ভাবে আমার মাথা ঘুরতে থাকে এবং আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে।

মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে আমি হৃষ্টচিত্তে বোম্বাই রওনা হলাম। স্ত্রী এবং কয়েক মাসের একটি শিশু ঘরে রইল। কিন্তু বোম্বাই উপনীত হবার পর আমার দাদার বন্ধুরা তাঁকে জানালেন যে জুন জুলাই মাসে ভারত মহাসাগর খুবই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ থাকে এবং এই আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রা বলে আমাকে নভেম্বরের আগে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

ইতিমধ্যে আমার স্বজাতীয়েরা আমার বিলাত যাত্রার ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। সমাজের লোকদের একটি সভা আহ্বান করা হল এবং আমাকে তাদের সকলের সম্মুখে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। হঠাৎ কি করে আমার সাহস হল বলতে পারি না। সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এবং দ্বিধাসংকোচ বর্জিত মনে আমি সভার সম্মুখীন হলাম। আমাদের সমাজের মুখপাত্রকে শেঠ আখ্যায় অভিহিত করা হত। তাঁর সঙ্গে আমাদের

একটা দূর সম্পর্ক ছিল এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাবও ছিল। তিনি আমাকে বললেন, "সমাজের মতে তোমার বিলাত যাবার প্রস্তাব সমীচীন নয়। আমাদের ধর্মে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া আমরা শুনেছি যে সে দেশে ধর্মের নির্দেশানুসারে চলা বা ধর্ম বাঁচান সম্ভবপর নয়। সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনা করতে হয়।"

এর উত্তরে আমি বললাম, "বিলাত যাওয়া আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ বলে আমি আদৌ মনে করি না। উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি সে দেশে যাচ্ছি। ইতিপূর্বেই আমার মায়ের কাছে আমি শপথ করেছি যে আপনারা যে-তিনটি জিনিসকে সব চেয়ে বেশী ভয় করেন, তার থেকে আমি দূরে থাকব। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই শপথ আমাকে নিরাপদে রাখবে।"

শেঠ এর উত্তরে বললেন, "কিন্তু আমরা তোমাকে বলছি যে, সে দেশে আমাদের ধর্ম রক্ষা করা যায় না। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ছিল, তা তুমি জান। তাই আমার কথা তোমার শোনা উচিত।"

আমি বললাম, "সে সম্বন্ধের কথা আমি জানি। আপনি আমার গুরুজন ব্যক্তি। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিরুপায়। আমি আমার বিলাত যাত্রার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারি না। আমার পিতার বন্ধু ও উপদেষ্টা জনৈক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আমার ইংলণ্ড যাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পান নি। এ ছাড়া আমার মা এবং দাদাও অনুমতি দিয়েছেন।"

"কিন্তু তুমি কি সমাজের নির্দেশ অমান্য করবে?"

"সত্য সত্যই আমি নিরুপায়। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।"

শেঠ এই কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। তিনি আমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। আমি মৌন হয়ে বসে রইলাম। অবশেষে শেঠ হুকুম দিলেন,—"আজ থেকে ছেলেটিকে জাতিচ্যুত বিবেচনা করা হবে। একে যারা সাহায্য করবে বা একে বিদায় দিতে যারা জাহাজ ঘাটে যাবে, তাদের পাঁচসিকা করে জরিমানা দিতে হবে।"

এই হুকুম আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। সুতরাং আমি শেঠের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তবে আমার দাদা এই নির্দেশকে কিভাবে গ্রহণ করবেন সে সম্বন্ধে আমার মনে চিন্তা ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি দৃঢ় রইলেন এবং আমাকে আশ্বাস দিয়ে লিখলেন যে শেঠের হুকুম সত্ত্বেও বিলাত যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনুমতি আছে।

আমার বন্ধুরা আমার জন্য জুনাগড়ের ব্যবহারজীবি শ্রীত্র্যম্বকারি মজুমদারের কেবিনেই একটি আসন রিজার্ভ করে রেখেছিল। এছাড়া তাঁকে তারা এই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে রাখে যে তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন। তিনি প্রবীণ ও ভূয়োদর্শী ছিলেন। আমি তখন মাত্র অষ্টাদশ বৎসরের যুবক এবং দুনিয়ার কোন অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। মজুমদার মহাশয় আমার বন্ধুদের আমার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করলেন।

অবশেষে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি বোম্বাই থেকে জাহাজে রওনা হলাম।

সমুদ্র বক্ষে

আমি ইংরেজী বার্তালাপে অভ্যস্ত ছিলাম না এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে মজুমদার মহাশয় ছাড়া আর সব যাত্রী ইংরেজ ছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। কারণ তাঁরা কথা বলতে এগিয়ে এলেও আমি তাঁদের বক্তব্য বুঝতে পারতাম না এবং যদিও বা কখনও বুঝতে পারতাম, তবু তার উত্তর দিতে পারতাম না। কোন কথা বলার আগে আমাকে মনে মনে একটি একটি শব্দ চয়ন করে বাক্যটি রচনা করে নিতে হত। ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করার অভ্যাস আমার ছিল না এবং ভোজ্য তালিকার ভিতরে কোন্ কোন্ আহার্য মাংসের সম্পর্কবর্জিত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার মত সাহস আমার হত না। অতএব আমি কখনও সকলের সঙ্গে বসে খেতাম না। সর্বদাই আমার খাবার কেবিনে আনিয়ে নিতাম এবং বাড়ী থেকে আনা মিষ্টি ও ফলমূল দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতাম। মজুমদার মহাশয়ের কোন অসুবিধা ছিল না, তিনি সকলের সঙ্গে মিশতেন। তিনি অবাধে ডেকের উপর ঘুরে বেড়াতেন এবং আমি সমস্তদিন কেবিনের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখতাম। ডেকে লোকজনের ভিড় কমলে আমি কখনও কখনও একটু ঘুরে আসতাম। যাতে আমি অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করি ও তাদের সঙ্গে অবাধে কথাবার্তা বলি তার জন্য মজুমদার মহাশয় আমাকে পীড়াপীড়া করতেন। তিনি আমাকে বলতেন যে আইন ব্যবসায়ীদের কথাবার্তায় চৌকস হতে হবে। তিনি তাঁর আদালত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শোনাতেন এবং আমাকে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করার

পরামর্শ দিতেন। বলতেন, ভুলত্রুটির জন্য লজ্জিত হবার কারণ নেই। বিদেশী ভাষায় কথা বলতে গেলে ওরকম একটু ভুল চুক হয়েই থাকে। তবে কোন কিছুই আমার লজ্জার আগড় ভাঙতে পারল না।

জনৈক ইংরেজ যাত্রী আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাকে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত করতেন। বয়সে তিনি আমার চেয়ে একটু বড়ই ছিলেন। আমি কি খাই, কি করি, কোথায় যাচ্ছি, কেন আমি এত লাজুক ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন। এছাড়া তিনি আমাকে খাবার টেবিলে বসার জন্য বলতেন। আমি মাংস না খাবার প্রতি জোর দিই বলে আমাকে ঠাট্টা করতেন এবং আমরা যখন লোহিত সাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তখন তিনি আমাকে বন্ধুভাবেই একবার বললেন, "এ পর্যন্ত তো যাই হক চলে গেছে; কিন্তু বিস্কে উপসাগরে পৌছে তোমাকে তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে। আর ইংলণ্ডে এত শীত যে সে দেশে মাংস ছাড়া বোধ হয় বাঁচাই যায় না।"

আমি বললাম, "কিন্তু শুনেছি সেখানে এমন লোকও আছেন যাঁরা মাংস ছাড়াও বেঁচে আছেন।"

তিনি বললেন, "নিশ্চিন্ত থাক, ওসব বাজে কথা। আমার জ্ঞানতঃ সে দেশে কোন নিরামিষাশী আছে বলে আমার জানা নেই। দেখছ না, আমি নিজে যদিও মদ্য পান করি তবু তোমাকে মদ খেতে বলছি না। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে তোমার মাংস খাওয়া উচিত; কারণ মাংস ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না।"

"আপনার সহৃদয় উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে আমার মায়ের কাছে আমি শপথ করে এসেছি যে আমি মাংস স্পর্শ করব না। সেই জন্য মাংসাহারের কথা আমি ভাবতেও পারি না। মাংস ছাড়া থাকা যায় না বলে যদি দেখা যায়, তাহলে সেখানে থেকে মাংস খাওয়ার পরিবর্তে আমি বরং ভারতবর্ষে ফিরে আসাই পছন্দ করব।"

আমরা বিস্কে উপসাগরে প্রবেশ করলাম। তবে মাংস বা মদ্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করলাম না। আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা যেদিন সাউথম্পটন পৌঁছলাম, সেদিন শনিবার ছিল। জাহাজে পরার জন্য আমার একটি কালো স্যুট ছিল। আমার বন্ধুরা সাদা রঙের ফ্ল্যানেলের যে স্যুটটি তৈরী করে দিয়েছিলেন, সেটি জাহাজ থেকে নামার বিশেষ অবসরে পরার জন্য তুলে রেখে দিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম জাহাজ থেকে নামার সময় সাদা পোষাকে আমাকে ভাল মানাবে এবং সেইজন্য ঐ সাদা ফ্ল্যানেলের স্যুট পরে নামলাম। সেপ্টেম্বরের শেষ হয়ে আসছিল এবং দেখলাম যে একমাত্র আমিই ঐ রকম সাদা পোষাক পরেছি। গ্রীণগু্লে অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক এক এজেন্টের কর্মচারীদের কাছে আমার যাবতীয় মালপত্র ও এমন কি তার চাবিও জমা রাখলাম। কারণ আরও অনেকে ঐ রকম করছিলেন দেখে আমারও মনে হ'ল যে আমার তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত।

জাহাজে একজন আমাকে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া হোটেলে ওঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি ও শ্রীযুক্ত মজুমদার তদনুযায়ী

সেখানে গেলাম। একমাত্র আমিই সাদা পোষাক পরে আছি —এই লজ্জায় আমি তখন মর-মর এবং হোটেলে গিয়ে যখন শুনলাম যে পরের দিন রবিবার পড়ছে বলে আমার জিনিস-পত্র গ্রীণগুলে কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, তখন আমার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল।

ডাঃ মেহেতাকে আমি সাউথম্পটন থেকে তার করেছিলাম। তিনি সেই দিনই প্রায় রাত্রি আটটার সময় এসে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। আমার সাদা ফ্ল্যানেলের পোষাক দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। কথাবার্তা বলতে বলতে আমি খেলাচ্ছলে তাঁর টুপিটি তুলে নিলাম এবং সেটি কত মোলায়েম পরীক্ষা করার জন্য উল্টো দিকে আমার হাত বুলিয়ে টুপির গাত্রস্থ লোমগুলি এলোমেলো করে দিলাম। ডাঃ মেহেতা ঈষৎ রুষ্টভাবে আমার কীর্তি-কলাপ দেখছিলেন। এবার তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। তবে ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গিয়েছিল। ঘটনাটি আমার ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ হল এবং ইউরোপীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ মেহেতা আমাকে প্রথম পাঠ দিলেন। তিনি বললেন—"অন্য কারও জিনিসপত্র ছোঁবে না! ভারতে আমরা যেমন প্রথম দর্শনেই কাউকে বহুবিধ প্রশ্ন করি, এদেশে তেমন করতে নেই। চিৎকার করে কথাবার্তা বলবে না। ভারতে কাথাবার্তা বলার সময় আমরা যেমন সাহেবদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করি, এদেশে তেমন করবে না। কারণ এদেশে কেবল পরিচারক ও অধস্তন ব্যক্তিরাই ওভাবে সম্বোধন করে থাকে।" এইরকম

আরও অনেক কিছু তিনি বললেন। তিনি আমাকে আরও জানালেন যে হোটেলে থাকার খরচ অনেক, কাজেই আমার কোন পরিবারের সঙ্গে থাকাই ভাল।

হোটেলের আদব-কায়দা আমার এবং মজুমদার মহাশয় উভয়ের পক্ষেই ভারস্বরূপ হয়ে উঠছিল। এছাড়া অত্যধিক খরচের প্রশ্ন তো ছিলই। মাল্টা থেকে আমাদের সঙ্গে জনৈক সিন্ধী যাত্রী এসেছিলেন এবং মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। তিনি লণ্ডনে নবাগত ছিলেন না। তিনি আমাদের জন্য বাসস্থান খুঁজে দেবেন বললেন। আমরা রাজী হলাম এবং সোমবারে আমাদের মালপত্র পাওয়ামাত্রই হোটেলের পাওনা চুকিয়ে আমরা সেই সিন্ধী বন্ধুর সন্ধান দেওয়া ঘরে চলে গেলাম। আমার মনে আছে হোটেলের প্রাপ্য হিসাবে আমাকে তিন পাউণ্ড দিতে হয়েছিল। এতবেশী দিতে হওয়ায় আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আর এত খরচ করা সত্ত্বেও আমি একরকম উপোসেই দিন কাটিয়েছিলাম। কারণ হোটেলের কোন ভোজ্যোপকরণই আমার ভাল লাগত না। একটা জিনিস ভাল না লাগলে আমি আর একটা চাইতাম, এর ফলে আমাকে দুটি জিনিসেরই দাম দিতে হত। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে এ যাবত আমি বোম্বাই থেকে আনা খাবারের উপরই নির্ভর করেছিলাম।

নতুন ঘরে এসেও আমার অস্বস্তি গেল না। দিনরাত আমার বাড়ী আর দেশের কথা মনে পড়ত, সর্বদা মায়ের স্নেহ-ভালবাসার কথা স্মরণপথে উদিত হত। রাতের বেলায়

চোখের জলে গাল ভেসে যেত এবং বাড়ীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্মৃতির রোমন্থনে দু' চোখের পাতা এক করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। অপর কাউকে এ দুঃখের ভাগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর তার উপায় থাকলেও তাতে লাভ কি? কিসে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায় তা আমি জানতাম না। এখানকার লোক-জন, তাঁদের আচার-ব্যবহার, এমন কি তাঁদের বাড়ী-ঘর—সবই আমার কাছে বিচিত্র মনে হত। ইংরেজী আদব-কায়দা আমার কাছে একেবারে নতুন জিনিস ছিল। তাই সর্বদা আমাকে সন্ত্রস্ত থাকতে হত। এর উপর নিরামিষ খাওয়ার সঙ্কল্পের জন্য আরও অসুবিধা হত। আমি খেতে পারি এরকম যা কিছু পেতাম তাই আমার কাছে বিস্বাদ লাগত। এইভাবে আমি যেন উভয় সঙ্কটে পড়লাম। ইংলণ্ড আমার সহ্য হচ্ছিল না; আর ভারতবর্ষে ফেরার কথা তো চিন্তারই বহির্ভূত ছিল। মন বলত, এসে যখন পড়েছি তখন যে কোন উপায়ে হোক্ তিনটি বছর কাটিয়ে দিতেই হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইংলণ্ডের ছাত্রজীবন

১০

লণ্ডনে

আমার দেখা পাবেন ভেবে ডাঃ মেহেতা সোমবার দিন ভিক্টোরিয়া হোটেলে গেলেন। হোটেল থেকে আমাদের নতুন ঠিকানা সংগ্রহ করে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ডাঃ মেহেতা আমার কামরা এবং আসবাবপত্র ঘুরে ফিরে দেখলেন এবং শেষকালে মাথা নেড়ে বিরাগ প্রকাশ করলেন। মুখে বললেন, "এখানে থাকা চলবে না। মুখ্যতঃ পড়াশুনা করার জন্যই আমাদের বিলাতে আসা নয়। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইংরেজদের জীবন-যাত্রা এবং আদব-কায়দা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এর জন্য তোমার কোন ইংরেজ পরিবারে থাকা দরকার। আমিই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম এবং ডাঃ মেহেতার বন্ধুর আবাসে গমন করলাম। তিনি ছিলেন সহানুভূতি ও সহৃদয়তার মূর্ত প্রতীক। তিনি আমার সঙ্গে নিজের ভাই-এর মত আচরণ করতেন। আমাকে তিনি ইংরেজী আদব-কায়দা ও ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে শেখালেন। তবে আমার খাওয়ার ব্যাপারটা প্রবল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নূন এবং মশলাবর্জিত সিদ্ধ শাক-সব্জী আমার মোটেই ভাল লাগত না।

গৃহকর্ত্রী বুঝেই উঠতে পারতেন না যে আমার জন্য তিনি কী রান্না করবেন। সকালবেলা আমি ওটের দালিয়া খেতাম এবং তাতে বেশ পেট ভরতো। তবে দুপুরে এবং রাত্রে প্রায়ই আমাকে উপবাসী থাকতে হত। বন্ধুটি আমাকে ক্রমাগত মাংস খাবার সপক্ষে যুক্তি দেখাতেন এবং আমি কেবল আমার শপথের কথা বলে নীরব থাকতাম। মধ্যাহ্ন এবং রাত্রে উভয় সময়েই আমরা সব্জি ও রুটি খেতাম এবং এর সঙ্গে জ্যামও থাকত। আমি বেশ ভালই খেতে পারতাম এবং ক্ষুধাও বেশ হত। তবে আমি দু'তিন টুকরার বেশী রুটি চাইতে পারতাম না; কারণ ওরকম করা ঠিক হবে কিনা ভয় হত। এর উপর দুপুর বা রাত্রি কোন সময়েই দুধ পেতাম না। এই সব দেখে বিরক্ত হয়ে বন্ধুটি একদিন বললেন, "তুমি আমার নিজের ভাই হলে এতদিনে তোমাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। এখানকার অবস্থা না জেনে নিরক্ষর মায়ের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কী মূল্য আছে? একে মোটেই শপথ বলা যায় না। আইনেও একে প্রতিজ্ঞার মর্যাদা দেবে না। এ জাতীয় প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে থাকা গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়। আর তোমাকে আমি বলে রাখছি এখানে এ প্রতিশ্রুতির জন্য তোমার কোন লাভ হবে না। তুমি স্বীকার করেছ যে এক সময় তুমি মাংস খেয়েছ এবং তা তোমার ভালও লেগেছিল। যেখানে এর কোন প্রয়োজন ছিল না, সেখানে তুমি মাংস খেয়েছ এবং যেখানে মাংস খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, সেখানে তুমি খেতে রাজী নও। কী আর বলব!"

আমি কিন্তু নতি স্বীকার করলাম না।

বন্ধুটি দিনরাত মাংস খাবার সপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে চললেন এবং আমি শাশ্বত 'না' নিয়ে এর সম্মুখীন হতে লাগলাম। তাঁর তর্কের বেগ যতই প্রবল হত আমার সংকল্প ততই দৃঢ় হত। নিত্য আমি এর জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতাম এবং তা পেতামও। আমার যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সম্যক ধারণা ছিল, তা নয়। বিশ্বাস আমার অন্তরে ক্রিয়া করছিল। এ সেই বিশ্বাস, বাল্যে যার বীজ আমার সাধ্বী চরিত্রের ধাত্রী রম্ভা আমার ভিতর বপন করেছিল।

এখনও পর্যন্ত নিয়মিতভাবে আমার পড়াশুনা আরম্ভ হয় নি। ভারতবর্ষে থাকতে কখনও আমি সংবাদপত্র পাঠ করি নি। কিন্তু এখানে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা আমি সংবাদ-পত্রের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে সমর্থ হলাম। এরজন্য ঘণ্টা-খানেকের বেশী সময় লাগত না। সুতরাং তারপর আমি এদিকে ওদিকে বেড়াতে আরম্ভ করলাম এবং ঘুরে ঘুরে নিরামিষ হোটেল খুঁজতে লাগলাম। ফ্যারিংডন স্ট্রীটে একটি নিরামিষ রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। মনোমত দ্রব্য পেলে শিশুর মনে যে আনন্দ হয়, এই রেস্তোরাঁটি দেখে আমারও মনের অবস্থা তদ্রূপ হল। রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করার মুখে কাঁচের শার্সির-আড়ালে বিক্রির জন্য রাখা কয়েকটি পুস্তকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। এর মধ্যে সল্ট লিখিত "নিরামিষ আহারের যুক্তি" বইটি আমার চোখে পড়ল। এক শিলিং মূল্যে বইখানি কিনে সোজা আমি খাবার ঘরে চলে গেলাম। ইংলণ্ডে পৌঁছাবার

পর এই প্রথম আমি মনের আনন্দে খেলাম। ভগবান আমাকে সাহায্য করলেন।

সল্টের বইখানি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করলাম এবং এর দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হলাম। এই বইখানা পড়ার পর থেকে আমি স্বেচ্ছায় নিরামিষাশী হয়েছি বলে বলতে পারি। যে দিন মায়ের কাছে নিরামিষ আহারের শপথ গ্রহণ করেছিলাম সে দিনটিকে আজ এক পরম সৌভাগ্যের লগ্ন বলে মনে হল। এবার আমি নিরামিষ আহারকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলাম এবং সেদিন থেকে এর প্রচার আমার জীবনের এক ব্রত হয়ে দাঁড়াল।

১১

ইংরেজ ভদ্রলোকের ভূমিকায়

আমার জন্য আমার বন্ধুর দুশ্চিন্তার বিরাম ছিল না। একদিন তিনি আমাকে নাটকাভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ করলেন। স্থির হয়েছিল যে অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে আমরা হবর্ণ রেস্তোরাঁতে আহার-পর্ব সমাধা করব। বন্ধুটি এই ভেবে আমাকে ওখানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন যে অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও আমি তাঁকে কোন রকম প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকব। হোটেলে বহুলোক তখন নৈশ ভোজন করছিলেন এবং আমি ও আমার বন্ধু তাদের মধ্যে গিয়ে একটি টেবিলের দুপাশে আসন গ্রহণ করলাম। প্রথমে সুপ এল। সুপ কিসের—এ প্রশ্ন মনে উদিত

হলেও বন্ধুকে তা জিজ্ঞসা করার সাহস হল না। তাই আমি পরিবেশককে ডাকলাম। বন্ধু আমার কার্যকলাপ দেখতে পেয়ে টেবিলের ওদিক থেকে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি পরিবেশককে ডাকছি? বেশ খানিকটা ইতস্তত করার পর আমি বললাম, "সুপ নিরামিষ কি না জানবার জন্য আমি ওকে ডেকেছি।" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, "তুমি ভদ্র সমাজের উপযুক্ত নও। যদি ভদ্রভাবে চলতে না পার তবে বরং তুমি উঠে যাও এবং অন্য কোন রেস্তোরাঁতে খেয়ে নিয়ে আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করো।" আমি এতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। কাছেই একটা নিরামিষ রেস্তোরাঁ ছিল; কিন্তু সেটি তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সে রাত্রে আমাকে অনাহারেই থাকতে হল। বন্ধুর সঙ্গে আমি নাটক দেখতে গেলাম বটে কিন্তু হোটেলে আমি যে দৃশ্যের অবতারণা করেছিলাম, সে সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করলেন না। আর আমার দিক থেকে তো বলার কিছু ছিলই না।

সেই আমাদের শেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ বিবাদ। আমাদের বন্ধুত্বের উপর এর তিল মাত্র প্রতিক্রিয়া হয় নি। আমার বন্ধুর যাবতীয় প্রচেষ্টার পিছনে তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রীতিই আমি দেখতে পেতাম এবং মনে মনে তার প্রশংসাও করতাম। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক মতানৈক্যের জন্য আমি তাঁকে অধিকতর শ্রদ্ধা করতাম।

তবে আমি স্থির করলাম যে তাঁকে আর উত্যক্ত করব না। তাঁকে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করব যে আমি আর ভদ্রসমাজের

অনুপযুক্ত হয়ে থাকব না। আমি সভ্য হবার চেষ্টা করব এবং ভদ্র সমাজের উপযুক্ত অন্যবিধ গুণাবলী অর্জন করে আমার নিরামিষাশীতার ক্ষতিপূরণ করব। এই উদ্দেশ্যে আমি ইংরেজ ভদ্রলোক সাজার অসম্ভব প্রচেষ্টায় ব্রতী হলাম।

বোম্বাইএ প্রচলিত ছাঁটকাটের যে সব পোষাক আমি পরছিলাম, তা ইংরেজ সমাজের অনুপযুক্ত বোধে বর্জন করলাম এবং 'আর্মি নেভী'র দোকান থেকে নতুন পোষাক তৈরী করালাম। এছাড়া উনিশ শিলিং ব্যয়ে এক "চিমনী পট" হ্যাট কিনে ফেললাম। সেকালের কথা ভাবলে নিঃসন্দেহে দামটা খুবই পড়েছিল বলতে হবে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আমি লণ্ডনের ফ্যাশানের কেন্দ্রবিন্দু বণ্ড স্ট্রীটের তৈরী এক ইভিনিং স্যুটের জন্য দশ পাউণ্ড নষ্ট করলাম এবং আমার মহান হৃদয় দাদার কাছ থেকে সোনার তৈরী ঘড়ির ডবল চেন আদায় করলাম। তৈরী টাই পরা ভদ্রসমাজের দস্তুর ছিল না; সুতরাং আমি নিজে হাতে টাই বাঁধার কৌশল শিখলাম। ভারতে থাকা কালে কদাচিৎ আয়নার দরকাব হত, বাড়ীর বাঁধা ক্ষৌরকার এলে আয়নায় মুখ দেখার সৌভাগ্য হত কিন্তু এখানে এক বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধার ও আধুনিকতম ফ্যাশানে চুল আঁচড়াবার জন্য প্রত্যহ দশ মিনিট সময় নষ্ট হতে লাগল। চুল আমার মোটেই নরম ছিল না এবং একে বাগ মানাতে তাই প্রত্যহ বুরুশ নিয়ে একরকম যুদ্ধ করতে হত। প্রত্যেকবার টুপি পরা ও খোলার সময় আপনা আপনিই হাত মাথার উপরে উঠে গিয়ে কেশগুচ্ছকে সুবিন্যস্ত করত। সভ্যসমাজে বসে থাকার

সময় হাতকে মুহুর্মুহু কেশদাম সুবিন্যস্ত করার যে দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত তার কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

এতেও যেন ষোল কলা পূর্ণ হচ্ছে না মনে করে ইংরেজ ভদ্রলোক হতে হলে আর যে সব খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমার ধারণা ছিল, আমি সেইসব বিষয় নিয়ে মেতে উঠলাম। শুনলাম সভ্য সমাজে মিশতে হলে নৃত্যকলা, ফরাসী ভাষা এবং বক্তৃতা দেওয়া শিখতে হয়। ফরাসী ভাষা কেবল ইংলণ্ডের প্রতিবেশীদের ভাষা নয়। ইউরোপের যেসব দেশে আমার বেড়াবার ইচ্ছা ছিল, সে সব দেশের সর্বত্র এই ভাষা সকলেব বোধগম্য। আমি এক নৃত্য বিদ্যালয়ে নৃত্য শেখা স্থির করলাম এবং প্রথম দফায় তিন পাউণ্ড বেতন জমা দিলাম। তিন সপ্তাহে বোধহয় ছয় দিন নাচ শিখতে গিয়েছিলাম। তবে তালে তালে পা ফেলা আমার কাছে এক অসম্ভব ব্যাপার মনে হল। আমি পিয়ানো বাজনার তাল ধরতে পারতাম না এবং তাই আমার পক্ষে তালে তালে পা ফেলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। তাহলে কি করা যায়? কথিত আছে এক ফকির ইঁদুরের অত্যাচার থেকে কৌপিন রক্ষা করার জন্য বিড়াল পুষেছিল। তারপর বিড়ালের আহার জোটাবার জন্য গরু পুষতে হল এবং গরুর দেখাশুনার জন্য লোক রাখতে হল। এইভাবে কৌপিনের জন্য ফকিরকে সংসারী হতে হল। আমার আকাঙ্ক্ষাও এই ফকিরের সংসারের মত ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল। ভাবলাম পাশ্চাত্য সঙ্গীত ঠিকমত বোঝার জন্য আমার বেহালা বাজান শেখা দরকার। সুতরাং বেহালার জন্য তিন পাউণ্ড ও তার

শিক্ষয়িত্রীর মাইনে বাবদ আরও কিছু ব্যয় করলাম। বক্তৃতা দিতে শেখার জন্য আর একজন শিক্ষকের কাছে গেলাম এবং প্রারম্ভিক বেতন হিসাবে তাঁকে এক গিনি দক্ষিণা দিতে হল। তারপর তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী বেল্ লিখিত "স্ট্যাণ্ডার্ড এলোকিউশনিস্ট" বইখানি কিনে ফেললাম। পিটের বক্তৃতা দিয়ে আমার বক্তৃতা-দান শিক্ষাপর্বের সূচনা হল।

কিন্তু শীঘ্রই আমার মনে প্রশ্ন জাগল যে এসবের উদ্দেশ্য কি? মনে মনে আমি ভাবলাম—আমি তো আর সারাজীবন ইংলণ্ডে কাটাব না! তাহলে বক্তৃতা দিতে শিখে কি হবে? আর নাচতে শিখে আমার ভিতর কোন্ সভ্যতাটা বাড়বে? বেহালা বাজান তো দেশে গিয়েও শেখা যায়। আমি যখন ছাত্র, তখন নিজের পড়াশুনা করাটাই সবচেয়ে বড় কথা। এখন আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া। চরিত্রগুণে যদি ভদ্র আখ্যা পাওয়া যায়, তাহলেই যথেষ্ট। নচেৎ আমার ভদ্রলোক হবার আশা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

এই জাতীয় চিন্তা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠল এবং বক্তৃতা-শিক্ষার শিক্ষক মহাশয়ের কাছে একটি চিঠি লিখে আমি আমার এই মনোভাব ব্যক্ত করলাম। আমি আর পাঠ নিতে যাব না বলে তাঁর কাছে ক্ষমা যাচ্ঞা করলাম। মাত্র দু' তিনটি পাঠই আমি নিয়েছিলাম। নৃত্য শিক্ষককেও এই মর্মে এক চিঠি লিখলাম এবং বেহালাবাদন শিক্ষয়িত্রীর কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁকে যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বেহালাটি বিক্রি করে দেবার অনুরোধ জানালাম। তাঁর সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত সখ্যতা হয়েছিল।

সুতরাং তাঁকে আমি জানলাম যে সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেছি যে এ যাবত আমি এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব করে আসছিলাম। আমি যে আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত করেছিলাম, তাকে তিনি অভিনন্দিত করলেন।

এই সভ্যতাব্যাধি প্রায় তিন মাসকাল আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবে পোষাক সম্বন্ধে সচেতনতা একাধিক বছর পর্যন্ত ছিল। এরপর আমি সত্যকার ছাত্র হলাম।

১২
পরিবর্তন

কেউ যেন একথা না ভাবেন যে নৃত্যশিক্ষা এবং আমার সভ্য হওয়ার অন্যান্য প্রয়াসের অর্থ হচ্ছে এই যে আমি বিলাস-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। পাঠক হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে তখনও আমি জানতাম যে আমি কি করছি। খরচ পত্রের ব্যাপারে আমি খুব হিসাবী ছিলাম।

জীবনযাত্রা পদ্ধতির উপর কঠোর দৃষ্টি রাখতাম বলে আমি ব্যয়সংকোচ করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। তাই আমি কোন পরিবারের সঙ্গে থাকার পরিবর্তে নিজেই ঘরভাড়া নিয়ে থাকা স্থির করলাম এবং যখন যেরকম কাজ করতে হবে, তখন সেইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বাসা বদল করার পরিকল্পনা করলাম। এই ব্যবস্থার ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। যখন যে এলাকায় আমি ঘরভাড়া নিতে লাগলাম সেখান থেকে

আধঘণ্টার মধ্যে পদব্রজে আমার কাজের জায়গায় পৌঁছান যেত। এর ফলে আমার গাড়ীভাড়া বেঁচে গেল। কিন্তু এর পূর্বে কোথাও যেতে হলে আমি সর্বদাই কোন না কোন প্রকারের যানবাহনের শরণ নিতাম এবং বেড়াবার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতাম। নতুন ব্যবস্থায় হাঁটা এবং পয়সা বাঁচান দুই এক সঙ্গে হল এবং এর ফলে প্রত্যহ আমি আট দশ মাইল হাঁটতে লাগলাম। প্রধানতঃ আমার এই হাঁটার অভ্যাসের জন্যই ইংলণ্ড প্রবাসকালে আমি কখনও কোন রোগে আক্রান্ত হই নি এবং তার ফলে আমার শরীর বেশ শক্ত সমর্থ হয়েছিল।

এইভাবে আমি দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে লাগলাম। এর একটি ছিল বসবার ঘর এবং অপরটি শয়নকক্ষ রূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায় আসতে তখনও দেরী ছিল।

এইসব পরিবর্তনের ফলে আমার অর্ধেক খরচের সাশ্রয় হল। কিন্তু সময় কাটাবার জন্য কি করব? আমি জানতাম যে ব্যারিস্টারী পড়তে খুব বেশী খাটতে হয় না। সেইজন্য আমি সময়ের অভাব বোধ করতাম না। আমি ইংরেজীতে কাঁচা ছিলাম এবং এই বিষয়টি ক্রমাগত আমার উৎকণ্ঠার কারণ হত। আমি ভাবলাম ব্যারিস্টারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সাহিত্যের স্নাতক হওয়ার গৌরবও অর্জন করা উচিত। আমি অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখলাম এবং এ সম্বন্ধে জনকয়েক মিত্রের সঙ্গেও আলোচনা করলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে এই দুই জায়গার কোথাও

যাওয়া স্থির করলে আমার খরচ অনেক বেড়ে যাবে এবং আমি যতদিনের জন্য তৈরী হয়ে এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশী দিন আমাকে ইংলণ্ডে থাকতে হবে। জনৈক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিলেন যে আমি যদি সত্য সত্যই কোন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ পেতে চাই তাহলে আমার লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করা উচিত। এর জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে এবং আমার সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডারও বহুলাংশে সমৃদ্ধ হবে। অথচ এর জন্য বিশেষ কিছু খরচ বাড়বে না। এ প্রস্তাব আমার মনঃপুত হল। কিন্তু এখানকার পাঠ্য-তালিকা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। ল্যাটিন এবং কোন আধুনিক ভাষা বাধ্যতামূলক ছিল। ল্যাটিন শিখব কি করে? বন্ধুটি কিন্তু এর সপক্ষে জোরাল যুক্তি দিয়ে বললেন, "আইনজীবিদের কাছে ল্যাটিন অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। আইন-গ্রন্থসমূহ বোঝার জন্য ল্যাটিনের জ্ঞান খুবই সহায়ক হয়। এছাড়া রোমান আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্নপত্র তো কেবল ল্যাটিনেই লিখিত থাকে। তার উপর ল্যাটিন জানার অর্থ হচ্ছে ইংরেজী ভাষার উপর অধিক মাত্রায় দখল থাকা।" এ যুক্তি আমার মন গ্রহণ করল এবং আমি স্থির করলাম যে যতই কঠিন হক না কেন ল্যাটিন আমি শিখবই। ইতিপূর্বেই আমি ফ্রেঞ্চ শেখা শুরু করেছিলাম। সুতরাং ভাবলাম ফ্রেঞ্চই আমার আধুনিক ভাষা হবে। আমি একটি প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে যোগদান করলাম। প্রতি ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা হত এবং আমার হাতে মাত্র পাঁচ মাস সময় ছিল। এর মধ্যে সাফল্য অর্জন করা আমার পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার

বলে বোধ হল। নিজেকে আমি অধ্যয়ননিষ্ঠ ছাত্রে রূপান্তরিত করে ফেললাম। প্রতিটি মিনিটের সদ্‌ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আমার দিনচর্যার একটা খসড়া তৈরী করলাম। তবে আমার বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি কোনটাই ঐ সময়ের ভিতর অন্যান্য বিষয় ছাড়াও ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ শেখার ব্যাপারে ভরসা পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। ফলে আমি ল্যাটিনে অকৃতকার্য হলাম। এতে দুঃখিত হলেও আমি সাহস হারাই নি। ল্যাটিনের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছিল এবং ভাবলাম আর একবার চেষ্টা করলে আমার ফ্রেঞ্চ ভাষার জ্ঞান আরও উৎকর্ষতা লাভ করবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি অপর একটি বিষয় নির্বাচন করা স্থির করলাম। ইতিপূর্বে আমি রসায়ন-বিজ্ঞান নিয়েছিলাম। কিন্তু হাতে কলমে কাজ করার সুবিধা না থাকার জন্য বিষয়টি আমার কাছে খুব আকর্ষক মনে হয় নি। অথচ রসায়ন-শাস্ত্র গভীর চিত্তাকর্ষক হওয়ারই কথা। ভারতবর্ষে থাকা কালে বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল বলে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্যও আমি এই বিষয়টি নির্বাচন করেছিলাম। এবার আমি অবশ্য রসায়নের পরিবর্তে "উত্তাপ ও আলোক" পড়া স্থির করলাম। লোকে একে সহজ বলত এবং আমার অভিজ্ঞতাও তাদের সঙ্গে মিলে গেল।

আর একবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনযাত্রা আরও সরল করার অন্য একটি প্রচেষ্টায় হাত দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে এখনও আমার জীবনযাত্রার ব্যয় আমাদের পরিবারের সাধারণ মানদণ্ডের অনুপাতে অনেক বেশী। আমার মহাপ্রাণ দাদাকে সংসার প্রতিপালন

করার জন্য কত না তীব্র সংগ্রাম করতে হচ্ছে! অথচ এরই মধ্যে তিনি নিয়মিতভাবে মুক্তহস্তে আমার টাকার চাহিদাও মিটিয়ে যাচ্ছেন—একথা চিন্তা করে আমার খুব দুঃখ হল। আমি দেখলাম যারা মাসে আট থেকে পনের পাউণ্ড খরচ করে তাদের অধিকাংশই ছাত্রবৃত্তি ভোগী। আমার সামনে এতদপেক্ষা বহুগুণ সরল জীবনযাত্রার নিদর্শন ছিল। আমার চেয়েও গরিবী চালে থাকে, এমন বহু ছাত্র আমি দেখেছি। তাদের মধ্যে একজন এক বস্তিতে সপ্তাহে দুই শিলিং ঘর-ভাড়া দিয়ে থাকত এবং লক হার্টের সস্তা কোকোর দোকান থেকে দুই পেন্সের কোকো ও পাঁউরুটি খেয়ে আহারপর্ব সমাধা করত। তার অনুকরণ করার চিন্তা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল। তবে আমার মনে হল যে দুটির পরিবর্তে একটা কামরাতেই আমার কাজ চলে যাওয়া উচিত এবং ঘরে কিছু রান্নাবান্না করে নিয়ে খাবার খরচও কমান যেতে পারে। এর ফলে মাসে চার-পাঁচ পাউণ্ড খরচেই আমার চলে যেতে পারে। এই সময় আমি সরল জীবন যাপনের কয়েকটি গ্রন্থও পাঠ করলাম। তাই আমি দুই কামরার ঘর ছেড়ে দিয়ে একটি কামরা ভাড়া নিলাম এবং একটি স্টোভ কিনে ঘরেই প্রাতরাশ তৈরী করা আরম্ভ করে দিলাম। এর জন্য আমার মিনিট কুড়িও সময় লাগত কি না সন্দেহ। কারণ আমাকে কিছু ওটের পরিজ তৈরী করতে হত এবং কোকোর জন্য জল গরম করে নিতে হত। মধ্যাহ্ন-ভোজন আমি বাইরেই সারতাম এবং ঘরে পাঁউরুটি ও কোকো সহযোগে নৈশ ভোজনপর্বেরও

সমাধা হতে লাগল। এইভাবে আমি দৈনিক এক শিলিং তিন পেন্স ব্যয়ে দিন চালাতে লাগলাম। এই সময় আমাকে যথেষ্ট পড়াশুনাও করতে হত। সাদাসিধা ভাবে থাকার জন্য আমি পড়াশুনা করার উপযুক্ত প্রচুর অবকাশ পেতাম এবং এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম।

পাঠক যেন না ভাবেন যে এই ধরণের জীবনযাত্রার ফলে আমাকে খুব কষ্ট সইতে হত। পক্ষান্তরে এ পরিবর্তন আমার পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক হয়েছিল। এ ছাড়া এ ব্যবস্থা আমাদের পরিবারের অর্থসঙ্গতির অনুকূলও ছিল। নিঃসন্দেহে আমার জীবনে আরও সত্যের প্রকাশ ঘটেছিল এবং মনে মনে আমি অসীম আনন্দ অনুভব করতাম।

ব্যয় ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন কি এর পূর্ব হতেই আমি আমার ভোজ্য তালিকার পরিবর্তন আরম্ভ করেছিলাম। বাড়ী থেকে যে মিষ্টি খাবার ও মশলা ইত্যাদি এনেছিলাম, তা খাওয়া বন্ধ করলাম। মন ভিন্ন মুখে মোড় নেওয়ায় মশলার প্রতি আকর্ষণ লুপ্ত হল। আমি এখন মশলা বর্জিত শাকসব্জী বেশ রুচির সঙ্গে খেতে আরম্ভ করলাম। এই জাতীয় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে স্বাদ জিভের উপর নির্ভর করে না, এর উৎস আমাদের মানসিক অবস্থা।

আর্থিক প্রশ্ন সর্বদাই আমার দৃষ্টির সামনে থাকত। সে সময় একদল লোক চা এবং কফিকে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর মনে করতেন এবং তাই তাঁরা কোকোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে একমাত্র সেই সব জিনিসই খাওয়া উচিত, যা শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর। তাই আমি স্বভাবতই চা ও কফি ছেড়ে দিয়ে কোকো পান করা আরম্ভ করলাম।

প্রধান পবীক্ষা-নিরীক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ছোটখাট পরীক্ষাও চলছিল। কিছুদিন শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য একেবারে বর্জন করলাম, এরপব আবার কিছুদিন কেবল ফল ও পাঁউ-রুটি খেয়ে কাটাতে লাগলাম এবং একবার কিছুদিন কেবল চিজ্, দুধ ও ডিম খেয়েই কাটল। শেষের পরীক্ষাটিই উল্লেখ-যোগ্য। এটি অবশ্য এক পক্ষকালের অধিক স্থায়ী হয় নি। যে সংস্কারকটি শ্বেতসার বর্জিত খাদ্যের সপক্ষে প্রচার করেছিলেন তিনি ডিমেব খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁর মতে ডিম মাংসের শ্রেণীতে পড়ে না। এ কথা স্পষ্ট যে ডিম খেলে প্রাণীহত্যা করা হয় না। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আমি ডিম খেতাম। তবে এ বিচ্যুতি সাময়িক। প্রতিজ্ঞার কোন নতুন ভাষ্য করার অধিকার আমার ছিল না। আমি আমার মায়ের কাছে শপথ গ্রহণ করেছিলাম এবং তাই তাঁর ভাষ্যই এক্ষেত্রে মান্য হওয়া উচিত। আমি জানতাম যে মাংস বলতে তিনি ডিমও বোঝেন। সেইজন্য আমি শপথের সত্যকার তাৎপর্য বুঝতে পারা মাত্রই ডিম খাওয়া ও ঐ পরীক্ষা—উভয়ই ত্যাগ করলাম।

নিরামিষ আহারে নবদীক্ষিত হবার উৎসাহে আমি আমার পাড়ায় একটি নিরামিষাশী সঙ্ঘ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করলাম। সঙ্ঘ কিছুদিন বেশ চলল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই এর

কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। কারণ মাঝে মাঝে পাড়া বদল করার আমার যে প্রথা ছিল, তদনুযায়ী আমি কিছুদিন পর সেই পাড়া ছেড়ে দিলাম। তবে এই সংক্ষিপ্তকালীন এবং ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ফলে প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালন-কার্যে আমি কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করলাম।

১৩

লাজুক স্বভাব আমার বর্ম

আমি নিরামিষাহারী সমিতির কার্যকারিণী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং এর প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত হওয়া আমার এক অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। তবে এ সব সভায় কখনও আমার মুখে কথা ফুটত না। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পরই আমি এই লাজুক স্বভাব জয় করতে সক্ষম হই। তবে কোনদিনই আমি পরিপূর্ণভাবে এর হাত এড়াতে পারি নি। পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে কোন কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অপরিচিত শ্রোতা সামনে থাকলেই আমি ঘাবড়ে যেতাম এবং পারতপক্ষে বক্তৃতা দেওয়া এড়িয়ে চলতাম।

আমাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ক্বচিৎ কখনও হাসির খোরাক জোটান ছাড়া আমার এই মুখচোরা স্বভাব আমার পক্ষে খুব একটা অসুবিধার কারণ হয় নি। বস্তুতঃ আমি মনে করি যে এর ফলে আমার হানির পরিবর্তে লাভই

হয়েছে। এক সময় কথা বলতে বাধ-বাধ ঠেকার জন্য রাগ হত; কিন্তু আজ তা আনন্দের কারণ হয়েছে। এর সব চেয়ে বড় লাভ হয়েছে এই যে এর ফলে আমার চিন্তা-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করার অভ্যাস হয়েছে। যে অল্প কথা বলে, সে কথাবার্তায় কদাচিৎ উচ্ছ্বাসের পরিচয় দেয়। সে প্রতিটি কথা ওজন করে বলে থাকে। মুখচোরা স্বভাব বাস্তব পক্ষে আমার আত্মরক্ষার বর্মস্বরূপ হয়েছিল। এর ফলে আমার বিকাশ সহজ হয়েছে। সত্য আবিষ্কারে এ হয়েছে আমার সহায়ক।

১৪

বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে পরিচয়

আমার ইংলণ্ড প্রবাসের দ্বিতীয় বৎসরের শেষ ভাগে দু'জন থিয়সফিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। এঁরা ছিলেন দুই ভাই এবং উভয়েই অবিবাহিত। তাঁরা আমার সঙ্গে গীতার প্রসঙ্গে চর্চা করলেন। তাঁরা তখন স্যার এডুইন আরনল্ড কৃত গীতার অনুবাদ "দি সঙ্ সেলেস্টিয়াল" পাঠ করছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মূল রচনা পাঠ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি একটু লজ্জা বোধ করলাম। কারণ এ যাবত সংস্কৃত বা গুজরাতী—কোন ভাষাতেই আমি এই অমর শ্লোকগুলি পড়ার সুযোগ পাই নি। আমাকে তাঁদের বলতে হল যে আমি গীতা পড়ি নি। তবে এ কথাও জানালাম

যে আমি সানন্দে তাঁদের সঙ্গে গীতা পাঠ করতে প্রস্তুত আছি এবং যদিচ সংস্কৃত ভাষায় আমার জ্ঞান যৎসামান্য, তথাপি আমি আশা করি যে আমি মূলের অর্থ উপলব্ধি করতে পারব এবং অন্ততঃ অনুবাদে যেখানে মূলের অর্থ প্রাঞ্জল হয়নি, সেই অংশগুলি তাঁদের বুঝিয়ে দিতে পারব। আমি তাঁদের সঙ্গে গীতা পাঠ আরম্ভ করলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই শ্লোক দুটি*

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সংগস্তেষুপজায়তে।
সংগাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩"

আমার মনে গভীর ছাপ রেখে গেল এবং আজও এ শ্লোক দুটি আমার কানের কাছে যেন গুঞ্জন করে ফেরে। গীতা আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে হল। সেইদিন থেকে এই ধারণা ক্রমশঃ আমার মনে পরিপুষ্টি লাভ করছে এবং আজ আমি এই গ্রন্থখানিকে সত্যোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সাধন বিবেচনা করি। দুঃখ ও বিষাদের দিনে গ্রন্থখানি আমাকে অপরিমিত সহায়তা দান করেছে।

থিয়সফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে স্যার এডুইন আরনল্ড রচিত "দি

---

* বিষয় চিন্তা করতে করতে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে হয়। তার থেকে কাম (কামনা) জন্মে। কামে বাধা পড়লেই ক্রোধ হয়। ক্রোধ হলে মানুষের কাণ্ডাকাণ্ড বিচার লুপ্ত হয়। এইরূপ মোহ হলে মানুষ সমস্ত সদুপদেশ ভুলে যায় এবং এই ভ্রম থেকেই বুদ্ধিভ্রম ও বুদ্ধি ভ্রংশ হলেই সর্বনাশ ঘটে।

লাইট অফ এসিয়া" (বুদ্ধের জীবনী ও বাণী) পাঠ করার পরামর্শ দিলেন। তখন পর্যন্ত আমি স্যার এডুইন আরনল্ডকে কেবল "দি সঙ্‌ সেলেস্টিয়ালের" লেখক রূপেই জানতাম। যাই হোক এই গ্রন্থখানি আমি ভগবদ্গীতার চেয়েও অধিকতর মনযোগ দিয়ে পড়লাম। বইখানি একবার শুরু করলে শেষ হবার আগে ছাড়া যায় না। থিয়সফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শে আমি মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির "কি টু থিয়োসফি" গ্রন্থখানিও পড়েছিলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠ করার পর আমার মনে হিন্দু ধর্মের অন্যান্য রচনাবলী পাঠ করার আগ্রহ জন্মাল এবং আমার মন থেকে মিশনারীদের দ্বারা প্রচারিত ধারণা দূর হয়ে গেল যে হিন্দুধর্ম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ।

প্রায় এই সময়েই নিরামিষাশীদের একটি বোর্ডিং গৃহে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আগত জনৈক সৎ খ্রীষ্টানের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তিনি আমার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি তাঁকে আমার রাজকোটের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলাম। সে বিবরণ শুনে তিনি ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন, "আমি একজন নিরামিষভোজী। আমি মদ্যপান করি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বহু খ্রীষ্টান মদ্য এবং মাংস দুই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থে মদ বা মাংস খাবার বিধান পাওয়া যাবে না। আপনি স্বয়ং বাইবেল* পাঠ

* খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটির নাম "দি ওল্ড টেস্টামেণ্ট।" একাধিক গ্রন্থের সমাবেশ এই অংশে হয়েছে। যীশুর পূর্বকালীন রচনাবলী এতে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়

করলে আমার উক্তির যথার্থতা বুঝতে পারবেন। আমি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলাম এবং তিনি আমাকে একখণ্ড বাইবেল সংগ্রহ করে দিলেন। এরপর আমি বাইবেল অধ্যয়ন করা আরম্ভ করলাম। তবে এর ওল্ড টেস্টামেণ্টের অংশ আমার কাছে কঠিন মনে হল।

কিন্তু নিউ টেস্টামেণ্ট আমার মনে ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করল। এর 'সারমন অন দি মাউণ্ট'* অংশ বিশেষভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করল। এর সঙ্গে আমি গীতার তুলনা করলাম। সারমনে বলা হয়েছে, "আমি তোমাকে বলছি যে তুমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে না। তোমার দক্ষিণ গণ্ডে যে চপেটাঘাত করবে, তার কাছে বাম, গণ্ডও পেতে দাও। আর যে তোমার কোটটি নিয়ে যাবে, তাকে তোমার জামাটিও নিয়ে যেতে দাও।" এই ছত্র ক'টি পাঠ করে আমি অপূর্ব পুলক বোধ করলাম এবং আমার শ্যামল ভট্টের সেই পঙ্‌ক্তি কয়টি মনে প'ড়ে গেল আমার তরুণ মন গীতা, দি লাইট অফ এসিয়া এবং দি সারমন অন দি মাউণ্টের উপদেশের ভিতর ঐক্য খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। ত্যাগই

খণ্ডটির নাম হয়েছে "দি নিউ টেস্টামেণ্ট"। যীশুখ্রীষ্টের পরবর্তী ক লীন রচনাবলী এতে স্থান পেয়েছে। নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম চার খানি বইএর নাম 'গসপেলস্'। এতে যীশুখ্রীষ্টের জীবনী ও বাণী বর্ণিত হয়েছে।—সম্পাদক

* পর্বতের সানুদেশে প্রদত্ত যীশুর উপদেশাবলী। ম্যাথুঃ পঞ্চম হতে সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য—সম্পাদক

ধর্মের পরাকাষ্ঠা—এই ভাব আমার কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বোধ হল।

"যে তোমারে দিয়াছে তৃষ্ণার জল।
ক্ষুধা তার নিবারিতে দাও মিষ্টফল।" ইত্যাদি

সে সময় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছিল বলে বাইরের বই পড়ার মত খুব বেশী অবকাশ আমি পেতাম না এবং তাই তখনকার মতো ধর্মের সঙ্গে এর চেয়ে বেশী পরিচয় করা হয়ে উঠল না। তবে আমি স্থির করে ফেললাম যে আমাকে আরও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে হবে এবং সব ক'টি মুখ্য ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

তৃতীয় খণ্ড

ভারতে ব্যারিস্টার রূপে

১৫

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আমি ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন 'বারের' সদস্যতা লাভ করলাম। ১১ই জুন আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবিদের তালিকাভুক্ত হলাম এবং পরদিবস স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলাম।

কিন্তু আমার পড়াশুনা শেষ হলেও মনের অসহায় অবস্থা ও ভয় যাচ্ছিল না। নিজেকে আমি আইনজীবির পেশা চালাবার উপযুক্ত বলে মনে করতে পারছিলাম না। আইন পড়লে কি হবে, আদালতে আইনজীবির কাজ করার কায়দা-কানুন আমি শিখি নি। এ ছাড়া ভারতীয় আইন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। হিন্দু আইন বা মুসলিম আইন সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। সাধারণ আর্জির খসড়া করাও আমার শেখা হয় নি। এই সব কারণে মনে মনে ভীষণ অসহায় বোধ করছিলাম। এই পেশায় নিজের খরচ চালাবার মত কিছু রোজগার করতে পারব কি না, সে বিষয়েও আমার মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

আমার দাদা বোম্বাইএর জাহাজ ঘাটে আমাকে নিতে এসে-ছিলেন। মাকে দেখার জন্য আমি ছট্‌ফট্ করছিলাম। কিন্তু দাদা তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাকে জানান নি। আমি ইংলণ্ডে

থাকার সময়ই তিনি পরলোকগমন করেছিলেন। বিদেশে আমাকে দুঃসংবাদ দিয়ে দাদা বিচলিত করতে চান নি। একথা বলাই বাহুল্য যে এ সংবাদে আমি ভীষণ আঘাত পেলাম। বাবার মৃত্যুর চেয়েও এবারকার বেদনা তীব্রতর হয়ে বাজল। আমার এতদিনের আশা ও কল্পনা চূরমার হয়ে গেল। তবে মনে আছে আমি দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি এমন কথা কাউকে ভাববার সুযোগ দিই নি। এমন কি আমি অশ্রুও সংবরণ করলাম এবং যেন কিছুই হয় নি, এইভাবে কাজকর্ম করতে লাগলাম।

আমার সমুদ্র-যাত্রার দরুণ সমাজে যে ঝড় উঠেছিল, তা তখন পর্যন্ত চলছিল। আমার আচরণের ফলে সমাজে দু'রকম বিচারধারা দেখা দিয়েছিল। একদল অবিলম্বে আমাকে সমাজে গ্রহণ করলেন এবং অপর দল সমাজচ্যুত করার সিদ্ধান্তের উপর অবিচলিত রইলেন। যাঁরা আমাকে সমাজে গ্রহণ করেন নি তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করার কোন আগ্রহই আমার ছিল না। এছাড়া বিরোধী দলের সমাজপতিদের বিরুদ্ধে আমার কোন মানসিক আক্রোশও ছিল না। এঁদের ভিতর জনকয়েক আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। আমি কৌশলে তাঁদের মনে আঘাত দেওয়া এড়িয়ে চলতাম। তাঁরা যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন, আমি তা পুরোপুরী মেনে চলতাম। তাঁদের নির্দেশে আমার শ্বশুর শাশুড়ী এবং এমন কি আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বাড়ীর দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ ছিল। আমাকে জল পান করতে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে অপরাধজনক ঘোষিত হয়েছিল। তাঁরা গোপনে এ বিধান ভঙ্গ করতে প্রস্তুত

ছিলেন ; কিন্তু যা প্রকাশ্যভাবে কবা সম্ভব নয়, গোপনে তার প্রশ্রয় দিতে আমি সম্মত ছিলাম না।

. আমার এই খোলামেলা আচরণের ফলে কখনও আমি সমাজেব কাছে বিড়ম্বনাব কাবণ হই নি। পক্ষান্তরে তখনও যাঁরা আমাকে সমাজচ্যুত করে রেখেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছ থেকে আমি স্নেহ ও ভালবাসাই পেয়েছিলাম। তাঁরা আমার কাজে সাহায্যও কবেছেন এবং এব বিনিময়ে কখনও আশা করেন নি যে আমি সমাজের জন্য কিছু করব। আমার বিশ্বাস আমার অপ্রতিরোধমূলক আচরণের জন্যই এ রকম সুফল-প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল। সমাজে আমাকে গ্রহণ করার জন্য যদি আমি আন্দোলন কবতাম, অথবা এই নিয়ে আরও দল বা উপদল সৃষ্টির জন্য চেষ্টা কবতাম কিংবা যদি আমি সমাজপতিদের চটাতাম, তাহলে নিশ্চয় তাঁরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন এবং তার ফলে আমাকে আবাব বিরুদ্ধ আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে পড়তে হত।

রাজকোটে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করা নিশ্চয়ই হাস্যকর ছিল। একজন অভিজ্ঞ উকিলের যে জ্ঞান থাকে আমার তার এক-শতাংশও ছিল না। অথচ ব্যারিস্টার হিসাবে তাঁদের ফি-এর দশগুণ আমি আশা করতাম। কোন মক্কেলই এত মূর্খ নয় যে দশগুণ ফি দিয়ে আমাকে নিযুক্ত করবেন।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন ও ভারতীয় আইন অধ্যয়নের জন্য বন্ধুরা আমাকে বোম্বাই যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এবং এরই সঙ্গে যে ছোটখাট মামলা পাওয়া যায় তাই করে যাব ঠিক হল। তাদের পরামর্শ আমার মনঃপূত হল এবং আমি বোম্বাই

উপনীত হলাম। কিন্তু একদিকে কোন আয় নেই এবং অন্যদিকে ক্রমাগত খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য বোম্বাই-এ চার পাঁচ মাসের বেশী থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এই সময় মামিভাই নামক একজনের একটি মামলা আমার হাতে এল। আমাকে বলা হল, "মামলাটা সামান্যই। তবে দালালকে* এর জন্য কিছু দালালি দিতে হবে।" আমি সোজাসুজি দালালি দেবার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলাম। তবে দালালি দিতে রাজী না হ'লেও মামলাটি আমি পেলাম। মামলাটি সহজ ছিল। আমার ফি বাবদ আমি ত্রিশ টাকা নিলাম। মামলাটি একদিনের বেশী চলার মতো ছিল না।

এই প্রথম আমি 'স্মল কজ কোর্টে' হাজিরা দিচ্ছি। আমাকে ফরিয়াদীর সাক্ষীদের জেরা করতে হবে। যথাসময়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু উঠেই দেখলাম আমার সমস্ত শক্তি ও সাহস লুপ্ত হয়ে গেছে। আমার মাথা ঘুরতে লাগল এবং মনে হল সমস্ত আদালত ঘরই বুঝি ঘুরছে। কোন প্রশ্নই আমার মাথায় এল না। বিচারক মহাশয় নিশ্চয় হেসেছিলেন এবং দৃশ্যটি উকিলদের কাছেও উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু আমি তখন চোখে কিছুই দেখছি না। সুতরাং আমি ধপ্ করে বসে পড়লাম এবং বাদীপক্ষকে বললাম যে আমার পক্ষে মামলা চালান সম্ভব নয় ও তাঁরা যেন এর জন্য শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে নিযুক্ত করেন। আমি তাঁদের 'ফি' বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত দিলাম। যথাসময়ে একান্ন টাকা দিয়ে শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে নিয়োগ করা হল। অবশ্য এ মামলা তাঁর কাছে ছিল ছেলেখেলার সামিল।

* যারা উকিলদের মামলা যোগাড় করে দেয়—সম্পাদক।

মক্কেল মামলা জিতল কি হারল সে সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর না নিয়ে আমি দ্রুতপদে আদালত থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজের প্রতি আমার ধিক্কার বোধ হচ্ছিল। স্থির করলাম যে মামলা চালাবার মত সাহস অর্জন না করা পর্যন্ত আর আমি কোন মোকদ্দমা হাতে নেব না।

আমার মনে হল আমি শিক্ষকতার কাজ করতে পারি। আমার ইংরাজীর জ্ঞান বেশ ভালই ছিল এবং ভাবলাম কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা মানের ছাত্রদের ইংরেজী পড়াতে ভালই লাগবে। এইভাবে অন্ততঃ আমার ব্যয়ের কিয়দংশও হয়ত রোজগার করতে পারব। সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে প'ড়ল: "প্রত্যহ এক ঘণ্টা ক'রে ইংরেজী পড়াবার জন্য একজন ইংরেজী শিক্ষক চাই। বেতন মাসিক ৭৫৲ টাকা।" কোন এক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়েছিল। আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করলাম এবং সাক্ষাতকারের জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। মনে খুব আশা নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় 'আমি গ্রাজুয়েট নই' শোনা মাত্র দুঃখের সঙ্গে আমার আবেদন বাতিল করলেন।

আমি বললাম—"কিন্তু ল্যাটিনকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করে আমি লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।"

"তা ঠিক, তবে আমরা গ্রাজুয়েট চাই।"

অতএব আর কোন উপায় ছিল না। আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার দাদাও যথেষ্ট দুশ্চিন্তা বোধ করছিলেন।

আমরা উভয়েই স্থির করলাম যে, বোম্বাইএ আর সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

সুতরাং আমি বোম্বাই ছেড়ে রাজকোটে গিয়ে দপ্তর খুলে বসলাম। এখানে একরকম মোটামুটি দিন চলে যেতে লাগল। আর্জি লেখা ও স্মারকলিপি রচনাদ্বারা আমি গড়ে ৩০০৲ টাকার মতো মাসিক রোজগার করতে লাগলাম। তবে এর জন্য আমার যোগ্যতা অপেক্ষা দাদার অংশীদারের প্রভাবের মূল্যই বেশী ছিল। তাঁর কাজ বেশ ভালভাবেই চলত। যে সব আর্জি সত্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ হত বা যাদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, সেগুলিকে তিনি বড় বড় ব্যারিস্টারের কাছে পাঠাতেন। আমার ভাগ্যে তাঁর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মক্কেলদের জন্য আর্জি লেখার ভার পড়ত।

১৬
প্রথম আঘাত

পোরবন্দরের পরলোকগত রাণা সাহেব গদিতে বসার পূর্বে আমার দাদা তাঁর সচিব ও উপদেষ্টার কাজ করতেন। এই সময় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে এই পদে নিযুক্ত থাকার সময় দাদা তাঁকে ভুল পরামর্শ দিয়েছিলেন। ব্যাপারটি পলিটিক্যাল এজেন্টের* কান পর্যন্ত যায় এবং তাঁর মনে আমার দাদার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ভাব জন্মে। এই রাজকর্মচারীটিকে

* ইংরেজ আমলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য সমূহে বৃটিশ স্বার্থ দেখার জন্য ভারত সরকারের প্রতিনিধি রূপে যে সব ইংরেজ কর্মচারী থাকতেন তাঁদের পদবী।—অনুঃ

আমি ইংলণ্ডে থাকার সময় থেকেই জানতাম এবং একথা বলা যায় যে তিনি আমার প্রতি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। আমার দাদা ভাবলেন এই বন্ধুত্বের সুযোগে আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাদার হয়ে দু-একটি কথা তাঁকে বলে দাদার সম্বন্ধে তাঁর মনে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে পারি। এ পরিকল্পনা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমার মন বলছিল ইংলণ্ডে যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় হয়েছে, এ ভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। দাদার যদি সত্য সত্যই দোষ হয়ে থাকে তাহলে আমার সুপারিশে কি ফল হবে? আর তিনি যদি নির্দোষ হন, তাহলে প্রচলিত পন্থানুযায়ী দরখাস্ত করা উচিত এবং নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস নিয়ে এর পরিণামের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। দাদার কিন্তু এ পরামর্শ মনঃপুত হল না। তিনি বললেন, "তুমি এখনও কাথিয়াওয়াড়কে চেন নি, আর সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান হতে তোমার আরও বহুদিন লাগবে। এখানে শুধু প্রভাবেরই মূল্য আছে। একজন পরিচিত রাজকর্মচারিকে কেবল দুটো মুখের কথা বললে যদি আমার একটা উপকার হয়, তাহলে ছোট ভাই হিসাবে তোমার এ দায়িত্ব এড়ান উচিত নয়।"

তাঁকে আমি 'না' বলতে পারলাম না এবং তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই রাজকর্মচারীটির কাছে গেলাম। আমি জানতাম যে তাঁকে এভাবে অনুরোধ করার কোন অধিকারই আমার নেই এবং আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমি আমার আত্মমর্যাদাবিরোধী কাজ করতে যাচ্ছি। তবু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলাম এবং এর জন্য সময়ও নির্ধারিত হল। আমি তাঁকে পুরাতন

পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দিলাম; কিন্তু অবিলম্বেই বুঝতে পারলাম যে ইংলণ্ড ও কাথিয়াওয়াড়ে অনেক পার্থক্য। বুঝলাম অবকাশ যাপনকারী ইংরেজ আর কর্তব্যরত রাজকর্মচারী এক ধাতুতে গড়া নয়। পলিটিক্যাল এজেণ্ট মহোদয় পূর্ব পরিচয়ের কথা ভোলেন নি, তবে সেই স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ায় তাঁর চেহারায় কঠোরতার আভাস ফুটে উঠলো। আমার মনে হল তাঁর সেই রূঢ়তার অর্থ হচ্ছে, "আপনি নিশ্চয় সেই পরিচয়ের দুরুপয়োগ করতে আসেন নি। কি ব্যাপার, সেইরকম কিছু মতলব আছে নাকি?" মনে হল যেন তাঁর কুঞ্চিত ভুরুতে কথাগুলি ফুটে উঠেছে। আমি অবশ্য আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম। সাহেব অধৈর্য হয়ে উঠলেন। রুষ্ট কণ্ঠে তিনি বললেন, "আপনার দাদা একজন ষড়যন্ত্রকারী। এ সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে আমি আর কিছুই শুনতে চাই না। আমার সময় নেই। আপনার দাদার কোন কিছু বক্তব্য থাকলে তিনি যেন যথা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবেদন করেন।" এই উত্তরই যথেষ্ট ছিল এবং সম্ভবতঃ এটা আমার প্রাপ্যও ছিল। কিন্তু স্বার্থ অন্ধ। আমি আমার কাহিনী আবার বলতে লাগলাম। সাহেব এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এবার আপনি বিদায় হোন।"

আমি বললাম, "কিন্তু অনুগ্রহ করে আমার কথাটা শুনেই দেখুন না।" এ কথায় তিনি আরও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর চাপরাশিকে ডেকে আমাকে বার করে দিতে বললেন। আমি তবুও চলে না গিয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম। অতএব চাপরাশিটি এসে আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে ঘরের বার করে দিল।

সাহেব ও চাপরাশি চলে গেলেন এবং রাগে ও দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে আমি সেই স্থান ত্যাগ করলাম। ফিরে এসেই তাঁকে আমি নিম্নলিখিত মর্মে এক নোটিশ পাঠালাম। "আপনি আমাকে অপমান করেছেন। আপনি আপনার চাপরাশি দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। আপনি এর প্রতিবিধান না করলে আমাকে আপনার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবে।"

অবিলম্বে তাঁর জবাব এল :

"আপনিই আমার প্রতি রূঢ় আচরণ করেছেন। আমি আপনাকে চলে যেতে বলা সত্ত্বেও আপনি স্থান ত্যাগ করেন নি। অতএব চাপরাশিকে দিয়ে আপনাকে বার করে দেওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন পথ ছিল না। আর সে আপনাকে অফিস থেকে চলে যেতে বলার পরেও আপনি যান নি। সুতরাং আপনাকে বার করে দেবার জন্য যতটুকু শক্তি প্রয়োগ না করলে নয়, তাই তাকে করতে হয়েছিল। এর পর আপনি যথাভিরুচি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।"

এই জবাব পকেটে পুরে লজ্জায় মর্মাহত অবস্থায় আমি ঘরে ফিরে এলাম এবং দাদাকে সব কিছু খুলে বললাম। তিনিও যথেষ্ট দুঃখীত হলেন; কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা দেবার কোন কিছু খুঁজে পেলেন না। সাহেবের বিরুদ্ধে কিভাবে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর উকিল বাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সেই সময় ঘটনাচক্রে স্যার ফিরোজশা মেটা একটি মামলার ব্যাপারে বোম্বাই থেকে রাজকোটে এসেছিলেন; কিন্তু আমার মতো এক নবীন ব্যারিস্টারের তাঁর সঙ্গে দেখা করার

সাহস হল না। সুতরাং তিনি যে উকিলের মারফত রাজকোটে এসেছিলেন তাঁর হাত দিয়ে আমি আমার মামলার কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠালাম ও এ সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলাম। তিনি বলে পাঠালেন, "গান্ধীকে বোলো যে বহু উকিল ব্যারিস্টারের নিত্য এরকম অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। সে তো এই সবে মাত্র ইংলণ্ড থেকে ফিরেছে এবং তার রক্তও গরম। গান্ধী এখনও বৃটিশ রাজকর্মচারীদের চেনে নি। তাকে যদি যা হোক কিছু রোজগার করে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে হয়, তাহলে সে যেন এসব কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে এবং অপমান হজম করে। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করে তার কোন লাভ হবে না। বরং এর ফলে খুব সম্ভব তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। তাকে বলে দিও যে দুনিয়ার হালচাল বুঝতে এখনও তার দেরী আছে।"

এই পরামর্শ আমার কাছে বিষবৎ কটু বোধ হলেও আমাকে এটা গলাধঃকরণ করতে হল। এ অপমান আমি সয়ে গেলাম, তবে এর দ্বারা আমি লাভবানও হলাম। মনে মনে ভাবলাম, "আর কখনও আমি এরকম বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে মাথা গলাব না, আর কখনও এভাবে বন্ধুত্বের অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করব না। তারপর থেকে আর কখনও আমি এ সঙ্কল্প ভঙ্গ করার মতো অপরাধ করি নি। এই আঘাত আমার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিল।

আমার অবশ্য ঐ রাজ-কর্মচারিটির কাছে যাওয়া অন্যায় হয়েছিল। তবে তাঁর অধৈর্যভাব ও মাত্রাহীন ক্রোধের তুলনায় আমার ভুল সামান্যই ছিল। আমি যা করেছিলাম তার জন্য

আমাকে ওভাবে বার করে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় নি। এদিকে আমার অধিকাংশ কাজকর্মই তাঁর আদালতে পড়বে। তাঁর কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে একবার তাঁর বিরুদ্ধে আইন সম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুমকি দেখানর পর আমার চুপচাপ করে থাকতে ভাল লাগছিল না।

ইতিমধ্যে আমি দেশের ঘরোয়ো রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করছিলাম। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে কাথিয়াওয়াড় গঠিত। সুতরাং স্বভাবতই এখানে সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের সুবর্ণ সুযোগ ছিল। এখানকার রাজন্যবর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতেন· এবং তাঁদের কান ভারী করার জন্য চাটুকারদের অভাব ছিল না। এমন কি সাহেবের চাপরাশিকেও ধরাধরি করতে হত। সাহেবের সেরেস্তাদার তো মালিকের চেয়েও এক কাঠি উপরে ছিলেন। কারণ তিনিই ছিলেন একাধারে সাহেবের চক্ষু, কর্ণ এবং দোভাষী। সেরেস্তাদারের ইচ্ছাই ছিল আইন। সবাই বলত যে তাঁর রোজগার সাহেবের আয়ের চেয়েও বেশী। এটা হয়ত অতিরঞ্জন, তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি সাধ্যাতিরিক্ত উঁচু চালে থাকতেন।

আমার কাছে এই পরিবেশ বিষবৎ বোধ হতে লাগল এবং এর মধ্যে থাকা আমার পক্ষে এক সমস্যা হয়ে উঠল।

এই মানসিক দ্বন্দ্বে আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, আমার দাদা স্পষ্টভাবে এটা বুঝতে পারলেন। আমাদের উভয়েরই মনে হল যে আমি যদি কোন চাকরি জোগাড় করতে

পারি তাহলে আমার পক্ষে এই দূষিত পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সদর পথে তো দেওয়ান বা বিচারকের চাকরি পাবার উপায় নেই। আর সাহেবের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে পশারেরও ক্ষতি হচ্ছে। কি যে করব আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ইতিমধ্যে পোরবন্দরের জনৈক মেমান দাদার কাছে নিম্নোক্ত মর্মে এক প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। "দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের ব্যবসা আছে। আমাদের কারবার বেশ বড় এবং আদালতে আমাদের ৪০,০০০ পাউণ্ড দাবীর একটি মামলা আছে। মোকদ্দমা অনেক দিন ধরেই চলছে। আমরা ভাল ভাল উকিল ব্যাবিস্টার নিয়োগ করেছি। আপনি যদি আপনার ভাইকে সেখানে পাঠান তবে এতে তাঁর এবং আমাদের—উভয় পক্ষেরই লাভ হবে। তিনি আমাদের পক্ষের আইন-জীবিদের আমাদের চেয়ে ভালভাবে মামলাটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন আর একটা নতুন দেশ দেখার এবং নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।"

আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালাম "কতদিন আমাকে সেখানে থাকতে হবে এবং আমার পারিশ্রমিক কত হবে?"

"এক বছরের বেশী নয় এবং আমরা আপনাকে প্রথম শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাদে নগদ ১০৫ পাউণ্ড দেব।"

এই টাকায় কোন ব্যারিস্টার সে দেশে যায় না। ঐ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ একজন কর্মচারী হওয়া। কিন্তু আমি তখন কোন উপায়ে ভারতবর্ষের বাইরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছি। এছাড়া নতুন দেশ দেখা ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রলোভন তো ছিলই। অধিকন্তু ঐ ১০৫ পাউণ্ডের সব টাকাটাই নগদ দাদার কাছে পাঠাতে পারব এবং তাতে ঘরের কিছুটা সাহায্য হবে—এ কল্পনাও ছিল। তাই আর কোন রকম দরাদরি না করে আমি ঐ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

চতুর্থ খণ্ড

দক্ষিণ আফ্রিকাতে

১৭

দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিতি

নাটালের বন্দরের নাম ডারবান। আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য আবদুল্লা শেঠ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ বন্দরে গিয়ে লাগল এবং অনেকে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জেটি থেকে জাহাজে উঠে এলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে এদের মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি তেমন সম্মানজনক ব্যবহার করা হচ্ছিল না। যাঁরা আবদুল্লা শেঠকে জানতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁর সঙ্গে যে রকম উন্নাসিক আচরণ করছিলেন, তা আমার দৃষ্টি এড়াতে পারল না। এতে আমার মন ব্যথিত হল। আবদুল্লা শেঠ এতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমার দিকে সকলেই যেন একটু বিস্মিতভাবে তাকাচ্ছিল। কারণ আমার পোষাক অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় একটু বিচিত্র ছিল। একটি ফ্রক কোট পরে মাথায় বাঙলা দেশের মত পাগড়ি বেঁধে আমি জাহাজ থেকে নেমেছিলাম।

ডারবানে পৌঁছবার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনে শেঠ আবদুল্লা আমাকে আদালত দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর এটর্নীর পাশে বসতে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে রইলেন এবং অবশেষে আমার পাগড়িটি খুলে ফেলতে বললেন। আমি এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর আদালত ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। অতএব এখানেও আমার কপালে লড়াই লেখা ছিল।

আমি এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লিখলাম এবং আদালতে আমার পাগড়ি পরার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলাম। এ ব্যাপার নিয়ে সংবাদপত্রসমূহে খুব আলোচনা হল এবং কয়েকটি সংবাদপত্র আমাকে "অবাঞ্ছিত আগন্তুক" আখ্যা দিল। এইভাবে এই ঘটনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনীত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই আকস্মিক ভাবে আমার কথা সে দেশে খুব রটে গেল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানের শেষদিন পর্যন্তও আমার পাগড়ি আমার মাথায়ই ছিল।

১৮

প্রিটোরিয়া অভিমুখে

আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে আইনজীবিদের কাছ থেকে চিঠি এল যে মামলার প্রস্তুতির জন্য শেঠ আবদুল্লা বা তাঁর কোন প্রতিনিধির প্রিটোরিয়া যাওয়া প্রয়োজন। আবদুল্লা শেঠ আমাকে পত্রটি পড়তে দিয়ে জানতে চাইলেন যে, আমি প্রিটোরিয়া যেতে পারব কিনা? আমি উত্তর দিলাম, "আপনার কাছ থেকে মোকদ্দমা বুঝে নেবার পর আমি এ সম্বন্ধে মতামত দিতে পারব। সেখানে গিয়ে কি করতে হবে, এখন পর্যন্ত তা-ই

আমি জানি না।" আমাকে মোকদ্দমাটি বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি তাঁর কেরানীকে আদেশ দিলেন।

ডারবানে পৌঁছবার সাত আট দিন পর আমি আবার সেখান থেকে রওনা হলাম। আমার জন্য রেলে একটি প্রথম শ্রেণীর আসন সংরক্ষিত ছিল। বিছানার প্রয়োজন হলে এর উপর পাঁচ শিলিং অতিরিক্ত দেবার প্রথা ছিল। আবদুল্লা শেঠ বিছানা নেবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু কতকটা এক গুয়েমী অহংকারের জন্য এবং পাঁচ শিলিং বাঁচাবার অভিপ্রায়ে আমি তাঁর কথা শুনলাম না। আবদুল্লা শেঠ আমাকে সতর্ক করে বললেন, "এদেশ ভারতবর্ষের মতো নয়। আর ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের অবস্থা যখন সচ্ছল তখন আপনার প্রয়োজনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করার দরকার নেই।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার জন্য উদ্বিগ্ন না হতে অনুরোধ করলাম।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় গাড়ী নাটালের রাজধানী মরিৎসবার্গে পৌঁছাল। এই স্টেশনে বিছানা দিয়ে যাবার নিয়ম। জনৈক রেল কর্মচারী আমার কাছে এসে বিছানা চাই কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "প্রয়োজন নেই। আমার কাছে বিছানা আছে।" তিনি চলে গেলেন। তারপর আর একজন যাত্রী কামরায় এলেন এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন,—আমি "কালা আদ্‌মী"। ফলে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে তিনি দুই-একজন রেল কর্মচারীকে নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁরা সবাই

এসে নীরবে সামনে দাঁড়াবার পর আর একজন কর্মচারী এসে বললেন, "আপনি এ কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আস্থন। আপনাকে নীচের শ্রেণীর কামরায় যেতে হবে।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমার তো প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।"

এবার অপর জন বললেন, "তাতে কি হয়েছে ? বলছি যখন, তখন নীচের শ্রেণীর কামরায় যেতেই হবে।" .

আমি বললাম—"আমিও বলছি যে ডারবান থেকে আমাকে এই কামরায়ই আসতে দেওয়া হয়েছে এবং আমি এই কামরাতেই যাব।"

কর্মচাবীটি উত্তর দিলেন, "না, আপনাকে এ কামরায় থাকতে দেওয়া হবে না। এ কামরা আপনাকে ছাড়তেই হবে। নচেৎ পুলিশ ডেকে আপনাকে কামরা থেকে বার করে দেওয়া হবে।"

—"ঠিক আছে, পুলিশ ডাকুন। নিজে থেকে আমি নেমে যাব না।"

পুলিশ কনস্টেবল এল। সে আমার হাত ধরে টেনে বার করল এবং আমার জিনিসপত্রও বার করে নিল। আমি অন্য কামরায় যেতে অস্বীকার করলাম এবং ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল। আমার হাত-ব্যাগটি নিয়ে আমি বিশ্রামাগারে গিয়ে বসলাম। অন্যান্য মালপত্র ঐখানেই পড়ে রইল। রেল কর্তৃপক্ষ সেগুলির ভার নিলেন।

সময়টা শীতকাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চ মালভূমিতে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। সমুদ্র-বক্ষ থেকে মরিৎসবার্গের উচ্চতা

অনেকটা হবার জন্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল। আমার ওভারকোটটি মালপত্রের ভিতর ছিল। কিন্তু আবার হয়ত অপমানিত হতে হবে, এই ভেবে তার খোঁজ করার সাহস হল না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি বিশ্রামাগারে বসে রইলাম। প্রায় মধ্য রাত্রে আর একজন যাত্রী এলেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু আমার তখন কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না।

আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্তব্যের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। আমি আমার অধিকার রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করব, না ভারতে ফিরে যাব? অথবা এইসব অপমানের কথা ভুলে গিয়ে প্রিটোরিয়া চলে যাব ও মোকদ্দমার কাজ শেষ করে ভারতবর্ষে ফিরব? দায়িত্ব পালন না করে দেশে ফিরে যাওয়া তো ভীরুতার পরিচায়ক। আমাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা হল বর্ণবিদ্বেষরূপী দৃঢ়মূল ব্যাধির বাহ্য প্রকাশ। সম্ভব হলে আমার কর্তব্য হচ্ছে এই রোগের মূল নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করা এবং এর জন্য যতই দুঃখকষ্ট হক না কেন, তা সহ্য করা। বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য আমার উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের যতটুকু প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত ততটুকুর জন্যই আমি চেষ্টা করব।

তাই আমি প্রিটোরিয়াগামী পরবর্তী ট্রেনে রওনা হওয়া স্থির করলাম।

পর দিবস প্রাতে আমি রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে একটি দীর্ঘ তার পাঠালাম এবং আবদুল্লা শেঠকেও ঘটনার বিবরণ

জানালাম। তিনি অবিলম্বে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। ম্যানেজার রেলওয়ে কর্মচারীদের আচরণ সমর্থন করলেন। তবে তিনি আবদুল্লা শেঠকে এই সংবাদও দিলেন যে আমি যাতে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই স্টেশন মাস্টারকে নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লা শেঠ মরিৎসবার্গের ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও অন্যান্য স্থানের বন্ধুবান্ধবদের আমার দেখাশুনা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। ব্যবসায়ীরা স্টেশনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁদের এই জাতীয় দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের কাছে শুনলাম এই জাতীয় ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাঁরা বললেন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবতীয় যাত্রীদের রেলওয়ে কর্মচারী ও শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীদেব কাছ থেকে সর্বদাই এ রকম ব্যবহার পেতে হয়। এইভাবে সমস্ত দিনটি দুঃখ-কষ্টের কাহিনী শুনতে শুনতে অতিবাহিত হল। সন্ধ্যায় গাড়ী এল। গাড়ীতে আমার জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। ডারবানে বিছানার জন্য টিকিট কিনতে অস্বীকৃত হলেও এখানে আমি একটি টিকিট কিনে নিলাম।

সকালে চার্লস্‌টাউনে পৌঁছলাম। সে সময়ে চার্লস্‌টাউন ও জোহানস্‌বার্গের মধ্যে রেল চলাচল করত না। এ পথে চলত একটি ঘোড়ার গাড়ী। পথে স্ট্যাণ্ডার্টনে রাত্রি যাপন করতে হত। আমার কাছে ঘোড়ার গাড়ীর জন্যও টিকিট ছিল। মরিৎসবার্গে একদিন আটকে যাওয়াতেও টিকিটখানি নষ্ট হয় নি।

এছাড়া আবদুল্লা শেঠ চার্লসটাউনে ঘোড়ার গাড়ীর অফিসে আমার যাওয়ার বিষয়ে তার করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীর অফিসের কর্মচারীটি আমাকে বাদ দেবার একটি অজুহাত খুঁজছিলেন। আমি নবাগত বুঝতে পেরে তিনি বললেন যে আমার টিকিট বাতিল হয়ে গেছে। আমি তাঁকে যথাযথ উত্তর দিলাম। কিন্তু গাড়ীতে স্থানাভাবের জন্য তিনি আমাকে ছাঁটাই করছিলেন না, এর অন্য কোন গূঢ় কারণ ছিল। যাত্রীদের গাড়ীর ভিতরে বসতে দেওয়া হত। কিন্তু আমি একে 'কুলি' তার উপর আগন্তুক। সুতরাং গাড়ী নিয়ে যে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীটি যাবেন, তাঁর মতে আমাকে গাড়ীর ভিতরে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের সঙ্গে বসান ঠিক হবে বলে মনে হল না। কোচোয়ানের আসনের দুই পাশেও বসার জায়গা ছিল। গাড়ীর ভারপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা এখানে বসতেন। আজ তিনি ভিতরে বসে আমাকে বাইরে তাঁর নির্দিষ্ট যায়গায় বসার অনুমতি দিলেন। এ যে নিতান্ত অন্যায় ও অপমানজনক এ কথা আমি বুঝতে পারছিলাম; কিন্তু এসব সহ্য করাই উচিত মনে হল। জোর করে ভিতরে ঢোকা সম্ভব ছিল না এবং মৌখিক প্রতিবাদ করলে আমাকে না নিয়েই হয়ত গাড়ী চলে যাবে। এর ফলে আরও একদিন পথে নষ্ট হবে এবং তার পরের দিনও যে কি হবে তা কে জানে? এইসব কথা চিন্তা করে আমি কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসলাম।

বেলা তিনটার সময় গাড়ী পার্ডিকোফ্ পৌঁছল। এইবার গাড়ীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি ধূম্রপান এবং হয়ত বা মুক্ত বায়ু সেবন

করার জন্য বাইরে বসার ইচ্ছা করলেন। অতএব তিনি এক টুকরা নোংরা চট কোচোয়ানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সেটি পাদানের উপর বিছিয়ে দিয়ে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, “স্বামী, তুমি ঐখানে বস। আমাকে এবার কোচোয়ানের পাশে বসতে হবে।” এ অপমান বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ভয় এবং উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আমি তাঁকে বললাম, “আমার ভিতরে বসার অধিকার থাকলেও আপনিই আমাকে এখানে বসিয়েছেন। সে অপমান আমি সহ্য করেছি। এখন আপনি বাইরে বসে ধূমপান করতে চান বলে আমাকে আপনার পায়ের কাছে বসতে বলছেন। আমি তাতে রাজী নই। তবে হ্যাঁ, এখানকার বদলে ভিতরে গিয়ে বসতে আমি প্রস্তুত আছি।”

আমার কথা শেষ হতে না হতেই কর্মচারীটি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আমার কর্ণমূলে এলোপাথাড়ি ঘুষি বর্ষণ করতে লাগলেন। আমার হাত ধরে তিনি গাড়ী থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি কোচোয়ানের আসনের পিতলের রেলিং চেপে ধরলাম এবং কব্জির হাড় ভেঙ্গে যাবার অশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মুষ্টি আলগা করব না বলে স্থির করলাম। অন্যান্য যাত্রীরা সেই দৃশ্য দেখছিলেন। কর্মচারীটি আমাকে গালাগালি, ধাক্কাধাক্কি ও প্রহারও করছেন, অথচ আমি চুপ করে রয়েছি। তাঁর দৈহিক শক্তি আমার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। কয়েকজন যাত্রীর মনে করুণার উদয় হল। তাঁরা বললেন, “ওহে, ওকে ছেড়ে দাও। ওকে আর মেরো না। ওর দোষ কি? ওতো ঠিক কথাই বলছে।

ওকে যদি ওখানে জায়গা না দাও তবে ও এসে এখানে আমাদের সঙ্গে বসুক। কর্মচারীটি "থামুন আপনারা" ব'লে চিৎকার করে উঠলেন। তবে মনে হল তিনি একটু লজ্জিত হয়েছেন এবং আমাকে প্রহার করা বন্ধ করলেন। তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ গালাগালি করলেন এবং তার পর কোচোয়ানের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট হটনটটু চাকরটিকে পাদানে বসতে বলে নিজে গিয়ে তার পরিত্যক্ত আসন দখল করলেন।

অন্যান্য যাত্রীদের নিজ নিজ আসনে বসার পর সিটি বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল। আমার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। জীবিত অবস্থায় আমি গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পারব কি না এই চিন্তা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেই কর্মচারীটি চক্ষু রক্তবর্ণ করে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গর্জে উঠলেন, "দাঁড়াও, একবার আমাকে স্ট্যাণ্ডার্ডটন পৌঁছতে দাও তারপর তোমাকে ভাল রকম শিক্ষা দেব।" আমি নিঃশব্দে বসে বসে ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলাম।

স্ট্যাণ্ডার্ডটনে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তবে পৌঁছান মাত্র কয়েকজন ভারতীয়ের মুখ দেখতে পেয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। গাড়ী থেকে নামতেই ঐ সব বন্ধুরা বললেন, "আমরা আপনাকে ইসা শেঠের দোকানে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। দাদা আবদুল্লা আমাদের তার করেছিলেন।" আমি খুব খুশী হলাম এবং শেঠ ইসা হাজী সুমারের দোকানে গেলাম।

আমি ঘোড়ার গাড়ীর কোম্পানীর এজেন্টকে সমস্ত ঘটনা জানাব স্থির করেছিলাম। অতএব যা কিছু ঘটেছিল তার বিবরণ দিয়ে তাঁকে একটি পত্র দিলাম এবং তাঁর কর্মচারী আমাকে যে শাসানি দিয়েছেন তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমি তাঁর কাছে এই আশ্বাস চাইলাম যে পর দিবস প্রাতে যাত্রা করার সময় তিনি যেন গাড়ীর ভিতরে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমার বসার বন্দোবস্ত করে দেন। এর জবাবে এজেন্ট মহোদয় লিখলেন, "স্ট্যাণ্ডার্টন থেকে যে গাড়ী ছাড়বে তা আরও বৃহৎ এবং অন্য লোক এর দায়িত্বে থাকবে। আপনি যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন কাল তিনি থাকবেন না এবং আপনি অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ভিতরে বসে যেতে পারবেন।" এর ফলে আমার মনে কিছুটা শান্তি এল। আমার অবশ্য প্রহারকারীর বিরুদ্ধে মামলা করার কোন ইচ্ছা ছিল না এবং তাই এইখানেই প্রহারপর্বের ইতি হল।

সকাল বেলায় শেঠের লোকেরা আমাকে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় পৌঁছে দিলেন। আমি বেশ ভাল বসার জায়গা পেলাম এবং রাত্রি বেলায় নিরাপদে জোহানস্‌বার্গে উপস্থিত হলাম।

স্ট্যাণ্ডার্টন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; কিন্তু জোহানস্‌বার্গ বেশ বড় শহর। আবদুল্লা শেঠ সেখানেও তার করেছিলেন এবং আমাকে মোহম্মদ কাসেম কামরুদ্দিনের দোকানের নাম ও ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ীর আড্ডায় তাঁদের লোক এসেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাই নি এবং তিনিও আমাকে চিনতে পারেন নি। তাই আমি

কোন হোটেলে ওঠা স্থির করলাম। কয়েকটি হোটেলের নাম আমার জানা ছিল। একটি গাড়ী ভাড়া করে আমি গ্রাণ্ড ন্যাশনাল হোটেলে গেলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আমি ঘর ভাড়া চাইলাম। তিনি একবার আমাকে নিরীক্ষণ করে বেশ ভদ্রভাবে উত্তর দিলেন, "অত্যন্ত দুঃখিত। ঘর সব ভরা।" সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি মহম্মদ কাসেম কামরুদ্দিনের দোকানে গেলাম। সেখানে আবদুল গণি শেঠ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি হৃদ্যতা সহকারে আমাকে গ্রহণ করলেন। আমার হোটেলের অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে তিনি প্রাণখোলা উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনি হোটেলে ঠাঁই পাবেন বলে ভাবলেন কি করে ?"

"কেন ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "এখানে কিছুদিন থাকলেই তার কারণ বুঝতে পারবেন।"

"দেখুন কাল আপনাকে প্রিটোরিয়া যেতে হবে। আপনাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই সফর করতে হবে। ট্রানস্ভালের অবস্থা নাটালের চেয়েও খারাপ। এখানে ভারতীয়দের কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটই বিক্রি করা হয় না।"

আমি রেলের আইন কানুন এনে পড়লাম। আইনের একটি ফাঁক ছিল। ট্রানস্ভালের পুরাতন আইন কানুনের ভাষা যথাযথ বা সুনিশ্চিত ছিল না। রেলের আইন কানুনের অবস্থা তো আরও খারাপ।

শেঠকে আমি বললাম, "আমি প্রথম শ্রেণীতেই যেতে

ইচ্ছুক। কোন কারণে তা সম্ভবপর না হলে ঐ সাঁইত্রিশ মাইল রাস্তা ঘোড়ার গাড়ীতে চলে যাব।”

এর ফলে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে ও সময় যাবে শেঠ আবদুল গণি তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তবে আমার প্রথম শ্রেণীতে যাবার প্রস্তাবে তাঁর সমর্থন ছিল। তাই এ সম্বন্ধে স্টেশন মাস্টারকে লেখা হল। পত্রে আমি এও উল্লেখ করলাম যে আমি একজন ব্যারিস্টার এবং সর্বদা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত। আমি তাঁকে আরও জানালাম যে আমাকে যথা সম্ভব শীঘ্র প্রিটোরিয়া পৌছতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে পত্রের জবাব পাবার জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই বলে আমি স্বয়ং স্টেশনে গিয়ে তাঁর নির্দেশ জেনে নেব ও সর্বশেষে এই আশা ব্যক্ত করলাম যে আমি নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাব। অবশ্য সাক্ষাতে উত্তর চাইবার পিছনে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে স্টেশন মাস্টার মহাশয় লিখিতভাবে জবাব দিলে নিশ্চয় আমার দাবি প্রত্যাখ্যান করবেন। বিশেষতঃ তাঁর মনে “কুলি” ব্যারিস্টার সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা থাকা স্বাভাবিক। অতএব আমি তাঁর সামনে নিখুঁত ইংরেজী পোষাকে উপস্থিত হব এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলে হয়ত তাঁকে আমার জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে রাজী করাতে পারব। সুতরাং আমি ফ্রককোট ও টাইএ শোভিত হয়ে তাঁর সামনে হাজির হলাম এবং টিকিট কেনার জায়গায় একটি গিনি দিয়ে আমার জন্য একটি প্রিটোরিয়ার টিকিট চাইলাম।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনিই কি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। টিকিট পেলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব। আজ আমার প্রিটোরিয়া পৌঁছান দরকার।"

তিনি ঈষৎ হাস্য করলেন এবং সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বললেন, আমি ট্রানস্‌ভালের অধিবাসী নই। আমার বাড়ী হল্যাণ্ডে। আমি আপনার মনোবেদনা বুঝতে পারছি এবং সেইজন্য আপনার প্রতি আমার সহানুভূতিও রয়েছে। আমি অবশ্যই আপনাকে টিকিট দিতে ইচ্ছুক। তবে একটি সর্ত আছে। গার্ড যদি আপনাকে তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যেতে বলেন, তাহলে আপনি আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। অর্থাৎ আপনি রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন মামলা করবেন না। প্রার্থনা করি আপনার যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হক। আমি বুঝতে পারছি আপনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।"

এই কথা বলে তিনি আমাকে টিকিট দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যথোচিত প্রতিশ্রুতি দিলাম।

শেঠ আবদুল গণি আমাকে বিদায় দিতে স্টেশনে এসেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর কাছে আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। তবে তিনি আমাকে সতর্ক করার জন্য বললেন, "আপনি নিরাপদে প্রিটোরিয়ায় পৌঁছালে আমি খুবই খুশী হব। আমার ভয় হচ্ছে যে গার্ড আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে শান্তিতে থাকতে দেবেন না এবং যদিও বা তিনি কোন হাঙ্গামা না করেন তাহলে আপনাব সহযাত্রীরা আপনাকে ছেড়ে দেবেন না।"

আমি প্রথম শ্রেণীতে আমার আসন গ্রহণ করলাম এবং গাড়ী ছেড়ে দিল। জার্মিস্টনে গার্ড টিকিট পরীক্ষা করতে এলেন। আমাকে প্রথম শ্রেণীতে দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং অঙ্গুলির ইশারাতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাবার হুকুম দিলেন। তাঁকে আমি আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখলাম। তিনি জবাব দিলেন। "তাতে কি হয়েছে ? তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাও।"

কামরায় অন্য একজন ইংরেজ যাত্রী ছিলেন। তিনি গার্ডকে ধমকে বললেন, "ভদ্রলোককে বিরক্ত করার অর্থ কি ? দেখছেন না ওর কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট রয়েছে ? ইনি আমার সঙ্গে থাকায় আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।" তারপর আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনি নিজের জায়গাতেই বেশ আরাম করে বসুন।"

গার্ড বিড় বিড় করে বললেন, "আপনি যদি একজন কুলির সঙ্গে এক সাথে যেতে চান, তবে আমার আর আপত্তির কি আছে ?" তিনি বিদায় নিলেন।

রাত প্রায় আটটার সময় গাড়ী প্রিটোরিয়ায় পৌঁছাল।

ঃ ১৯ ঃ

প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রিটোরিয়া স্টেশনের অবস্থা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। মিট্ মিট্ করে বাতি জ্বলত, যাত্রীর সংখ্যাও ছিল অল্প। আমি অন্যান্য যাত্রীদের চলে যাবার

অপেক্ষা করছিলাম। ভেবেছিলাম যে টিকিট কালেক্টরের কাজ শেষ হলে আমি আমার টিকিট জমা দেব এবং তাঁর কাছ থেকে হোটেল বা ঐ জাতীয় কোন রাত্রিবাসের জায়গার কথা জেনে নেব। আর সেরকম কোন সুবিধা না থাকলে রাতটা স্টেশনেই কাটিয়ে দেব। অবশ্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পাছে অপমানিত হই, এই আশঙ্কায় তাঁকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই আমার মনে ইতস্তত হচ্ছিল।

স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে গেল। আমি টিকিট কালেক্টরের হাতে টিকিটটি দিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি বেশ সৌজন্য সহকারে আমার কথার উত্তর দিলেও আমি দেখলাম যে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে না। তবে পাশেই একজন আমেরিকান নিগ্রো দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন।

তিনি বললেন, "আপনি দেখছি এখানে সম্পূর্ণ নবাগত এবং আপনার কোন পরিচিত বন্ধুও নেই। আপনি আমার সঙ্গে এলে আপনাকে একটি ছোট হোটেলে নিয়ে যেতে পারি। এর আমেরিকান মালিকের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে এবং আমার বিশ্বাস তিনি আপনাকে থাকার জায়গা দেবেন।"

ভদ্রলোক তাঁর প্রতিশ্রুতি কতটা রাখতে পারবেন এ সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগলেও আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে "জনস্টনস্ ফ্যামিলি হোটেলে" নিয়ে গেলেন। তিনি শ্রীযুক্ত জনস্টনকে একদিকে ডেকে নিয়ে আমার কথা বললেন এবং শ্রীযুক্ত জনস্টন আমাকে

একটি শর্তে সে রাত্রের মতো স্থান দিতে সম্মত হলেন। আমাকে রাতের খাবার আমার ঘরে বসেই খেতে হবে।

তিনি বললেন, "আপনি বিশ্বাস করুন আমার ভিতর কোন রকম বর্ণবিদ্বেষ নেই। কিন্তু আমার খদ্দেররা সবাই ইউরোপীয়। তাই আপনাকে যদি খাবার ঘরে খেতে দিই, তাহলে তাঁরা হয়ত ক্রুদ্ধ হবেন এবং এমন কি হয়ত এ জায়গা ছেড়ে চলেও যেতে পারেন।"

আমি উত্তরে বললাম, "রাত্রিটার মতো আমাকে আশ্রয় দেওয়াব জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এখন এখানকার হালচাল মোটামুটি জেনেছি এবং তাই আপনার অসুবিধা বুঝতে পারছি। ঘরে খাবার দেবার জন্য আমি কিছুই মনে করব না। কাল আমি অন্য কোন বন্দোবস্ত করে নিতে পারব বলে আশা করছি।"

আমাকে যে ঘর দেওয়া হয়েছিল সেখানে একা বসে খাবাবের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নিজের মনেই চিন্তা কবছিলাম। হোটেলে খুব বেশী অতিথি ছিল না এবং শীঘ্রই খাবার এসে যাবে বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু পরিচারকের বদলে শ্রীযুক্ত জনস্টন নিজেই দেখা দিলেন। তিনি বললেন, "আপনাকে ঘরে বসে খাবার খেতে বলায় আমার লজ্জা করছিল। তাই আমি অন্যান্য অতিথিদের কাছে আপনার কথা বলি এবং আপনি খাবার ঘরে বসে খেলে তাঁরা আপত্তি করবেন কি না জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁদের কোনই আপত্তি নেই এবং আপনার যত দিন ইচ্ছা আপনি এখানে থাকতে পারেন।

অতএব আপনার অসুবিধা না হলে আপনি খাবার ঘরে চলুন এবং আপনার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকুন।" আমি তাঁকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে খাবার ঘরে গেলাম এবং আনন্দ সহকারে ভোজন করলাম।

পরদিবস আমি আমাদের এটর্ণী শ্রীযুক্ত বেকারের কাছে উপস্থিত হলাম। আবদুল্লা শেঠ আমাকে তাঁর কথা পূর্বেই কিছুটা জানিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছ থেকে হৃদ্যতাপূর্ণ স্বাগত সম্ভাষণ শুনে বিস্মিত হলাম না। তিনি গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি আমার সব কথা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "এখানে আপনার কাছ থেকে আমরা ব্যারিস্টারের কাজ নিতে পারব না; আমরা স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীকে আমাদের পক্ষে নিযুক্ত করেছি। মামলাটি বহুদিন যাবত চলছে এবং একটু জটিলও বটে। সুতরাং মামলা সংক্রান্ত খবরাখবর পাবার জন্যই আমরা আপনার সহায়তা নেব। এতে অবশ্য আমার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটা সহজতর হবে; কারণ এরপর আমি আপনার মারফতই তাঁর কাছ থেকে যাবতীয় সংবাদ নেব। এর ফলে নিঃসন্দেহে সুবিধা হবে। এখনও আপনার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি। ভেবে-ছিলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করার পরই এর বন্দোবস্ত করব। কিন্তু এখানে উৎকট রকমের বর্ণ-বিদ্বেষ বিদ্যমান। কাজেই আপনার মতো লোকের জন্য বাসস্থান সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে আমার সঙ্গে জনৈক দরিদ্র মহিলার পরিচয়

আছে। তিনি একজন রুটি প্রস্তুতকারীর স্ত্রী। আমার মনে হয় তিনি আপনাকে থাকার জায়গা দেবেন এবং এতে তাঁর আয়ও কিঞ্চিৎ বাড়বে। চলুন, আমরা তাঁর বাড়ী যাই।"

তিনি আমাকে সেই মহিলার বাড়ী নিয়ে গেলেন। মহিলাকে একান্তে ডেকে নিয়ে তিনি আমার কথা বললেন এবং সেই মহিলা সাপ্তাহিক ত্রিশ শিলিংএর বিনিময়ে আমাকে তাঁর বাড়ীতে রাখতে সম্মত হলেন।

: ২০ :

ভারতীয় সমস্যার সঙ্গে পরিচয়

প্রিটোরিয়ায় থাকার ফলে আমি ট্রানস্‌ভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি-স্টেটের ভারতীয়দের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে জানার সুযোগ পেলাম। তখন আমি একথা বুঝতে পারি নি যে ভবিষ্যতে এই জ্ঞান আমার কত উপকারে লাগবে।

ট্রানস্‌ভালে প্রচলিত একটি আইনের পরিবর্তনের খসড়া রচিত হচ্ছিল এবং তদনুযায়ী প্রতিটি ভারতীয়কে ট্রানস্‌ভালে প্রবেশের জন্য তিন পাউণ্ড কর দিতে হবে বলে স্থির করা হচ্ছিল। নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া ভারতীয়দের দ্বারা জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হচ্ছিল এবং যেখানে তাদের জমি থাকবে, সেখানেও বস্তুতঃ তাদের তার উপর পূর্ণ সত্ত্ব না দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। তাদের ভোটের অধিকার ছিল না। এসিয়াবাসীদের

জন্য যে বিশেষ আইন রচিত হচ্ছিল, এইসব ধারা তার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে কৃষ্ণকায়দের সম্বন্ধে যে সব আইন রচিত হয়েছিল, তাও এসিয়াবাসীদের উপব প্রযোজ্য ছিল।

নূতন আইন অনুসারে ভারতীয়দের সর্বসাধারণের ব্যবহার যোগ্য ফুটপাথের উপর দিয়ে চলা নিষিদ্ধ হল এবং অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে রাত নয়টার পর তাদের বাড়ীর বাইরে যাবার অধিকার রইল না। শ্রীযুক্ত কোটস্ নামক এক বন্ধুর সঙ্গে আমি কখনও কখনও রাত্রি বেলায় বেড়াতে যেতাম এবং সাধারণতঃ দশটার পূর্বে ফিরতাম না। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করলে কী হবে? এ-বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রীযুক্ত কোটসেরই বেশী দুশ্চিন্তা ছিল। তিনি তাঁর নিগ্রো চাকরদের জন্য 'পাস' দিতেন। কিন্তু আমাকে তো তা দিতে পারেন না। প্রভুর ভৃত্যকেই পাস দেবার অধিকার ছিল। আমি যদি তাঁর কাছে পাস চাইতাম এবং তিনি যদি আমাকে পাস দিতে প্রস্তুত হতেন, তাও প্রতারণার পর্যায়ে পড়বে বলে তাঁর পক্ষে আমাকে পাস দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

সুতরাং শ্রীযুক্ত কোটস্ অথবা তাঁর এক বন্ধু আমাকে সরকারী এটর্ণী ডাঃ ক্রাউসের কাছে নিয়ে গেলেন। পরিচয়ে প্রকাশ পেল যে আমরা একই "ইনের" ব্যারিস্টার। রাত নয়টার পর বাইরে থাকার জন্য আমারও পাসের প্রয়োজন শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি আমার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আমাকে পাস দেবার পরিবর্তে তিনি একটি বিশেষ অনুমতি পত্র দিলেন। এর বলে পুলিশের হস্তক্ষেপ বিনা যখন

তখন বাইরে ঘোরার অধিকার আমার হল। বাইরে বেরোবার সময় সর্বদাই আমি এই অনুমতি পত্রটি সঙ্গে রাখতাম। অবশ্য কোনদিন যে এর ব্যবহার করতে হয়নি—এটা একটা নিছক দৈব ঘটনা।

ফুটপাথের উপর দিয়ে না চলার নির্দেশনামার পরিণাম আমার পক্ষে গুরুতর হল। আমি বরাবর প্রেসিডেন্ট স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি খোলা ময়দানে বেড়াতে যেতাম। প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের বাড়ী এই রাস্তার উপর ছিল। বাড়ীটির চেহারা অতীব সাধারণ। এর সামনে কোন বাগানও ছিল না এবং আশে পাশের বাড়ীর ভীড় থেকে একে পৃথক করে চেনাও যেত না।

কেবল বাড়ীটির সম্মুখে একজন পুলিশ থাকায় বোঝা যেত যে এটি কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর আবাসস্থল। আমি প্রায়ই এই ফুটপাথের উপর দিয়ে যেতাম এবং এই জায়গাটা পার হবার সময় পাহারাদারের সঙ্গে কোন দিনই কোন রকম তর্ক বিতর্ক বা বাক্ বিতণ্ডা হয় নি।

নিয়মিতভাবে এই পাহারাওয়ালার পরিবর্তন ঘটত। একদিন এখানকার পাহারাওয়ালাটি আমাকে বিন্দু মাত্র সতর্ক না করে এবং এমন কি আমাকে ফুটপাথ থেকে নেমে যাবার নির্দেশ পর্যন্ত না দিয়েই ধাক্কা দিতে দিতে ও লাথি মারতে মারতে আমাকে রাস্তায় ফেলে দিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পাহারাওয়ালাকে তার এই জাতীয় আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পূর্বেই শ্রীযুক্ত কোটস্ আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি

ঘোড়ায় চড়ে ঐ জায়গা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "গান্ধী, আমি আগাগোড়া সব ব্যাপার দেখেছি। আপনি যদি এই লোকটির বিরুদ্ধে মামলা করেন তাহলে সানন্দে আমি আপনার সাক্ষী হব। আপনি এমন অভদ্রভাবে প্রহৃত হয়েছেন বলে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

আমি বললাম, "দুঃখের কোন কারণ নেই। ও বেচারা কি জানে? ওর কাছে সকল কৃষ্ণকায়ই সমান। নিশ্চয়ই ও নিগ্রোদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহারই করে থাকে। ব্যক্তিগত অভিযোগ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হব না বলে আমি স্থির করেছি। অতএব আমি ওর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করব না।"

শ্রীযুক্ত কোটস্ উত্তর দিলেন, "একথা আপনারই উপযুক্ত বটে। তবে এ সম্বন্ধে আবার ভেবে দেখুন। এই সব লোকদের উচিত মতো শিক্ষা দেওয়া দরকার।" তারপর তিনি পাহারা-ওয়ালার সঙ্গে কথা বললেন ও তাকে বকলেন। তবে আমি তাঁদের কথাবার্তা বুঝতে পারি নি; কারণ তাঁরা ডাচ্ ভাষায় কথা বলছিলেন। পুলিশটি ছিল বোয়র। সে আমার কাছে ক্ষমা চাইল। অবশ্য এর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমি তাকে ইতিপূর্বেই ক্ষমা করেছিলাম।

তবে আমি আর কখনও ঐ রাস্তায় যাই নি। আবার নূতন লোক পাহারায় আসবে এবং এই ঘটনার কথা তার জানা থাকবে না বলে সেও এর মতো আচরণ করবে। মিছামিছি আর একবার লাথি খেয়ে লাভ কি? তাই আমি অন্য পথে যেতাম।

আমি বুঝতে পারলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকা আত্মসম্মানসম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষে বাসোপযোগী নয়। তাই আমার মন ক্রমশঃ এই অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় অনুসন্ধান করতে লাগল। তবে সে সময় আমার প্রধান কর্তব্য ছিল দাদা আবতুল্লার মোকদ্দমার জন্য কাজ করা।

: ২১ :

মোকদ্দমা

সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে মামলার ব্যাপারে 'দাদা অবতুল্লার পক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাই আইন তাঁর সপক্ষে যেতে বাধ্য। তবে আমি এও বুঝতে পারলাম যে বেশী দিন মোকদ্দমা চালালে তিনি এবং তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ—উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য। অথচ তাঁরা পরস্পরের আত্মীয় এবং একই নগরের অধিবাসী। মামলা যে কত দিন চলবে তা বলা অসম্ভব। উভয় পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদের মধ্যে আপোষ করে দেবার তাগিদ আমি অনুভব করলাম। অবশেষে বহু চেষ্টায় তাঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করতে সক্ষম হলাম।

এর ফলে উভয়েই আনন্দিত হলেন। জনসাধারণের কাছে উভয়ের সম্মান বৃদ্ধি পেল। আমিও অত্যন্ত প্রীত হলাম। আমি আইনজীবির সত্যকার কর্তব্য শিখলাম। আমি মানব-চরিত্রের উজ্জ্বল দিক আবিষ্কার করার শিক্ষা পেলাম এবং

মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে শিখলাম। আমি বুঝলাম যে আইনজীবির যথার্থ কর্তব্য হচ্ছে বিবদমান পক্ষের ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া দেওয়া। এই শিক্ষা আমার মনে এমন গভীর দাগ কেটেছিল যে আমার বিশ বৎসরের ব্যবহারজীবির জীবনের অধিকাংশ কাল আমি কেবল শত শত মোকদ্দমা আদালতের বাইরেই মিটিয়ে ফেলার কাজে লিপ্ত ছিলাম। এর পরিণামে আমার কোন ক্ষতি হয় নি। বিবেককে তো খোয়াতে হয়ই নি, আমার কোন আর্থিক লোকসানও হয় নি।

ঃ ২২ ঃ

ভগবানের ইচ্ছা

মোকদ্দমা মিটে যাবার পর আমার আর প্রিটোরিয়া থাকার কোন কারণ রইল না। তাই আমি ডারবানে ফিরে গিয়ে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। তবে ভাল মতো একটা বিদায় অভিনন্দন না দিয়ে আবদুল্লা শেঠ আমাকে চলে যেতে দিতে চাইলেন না। আমার সম্মানার্থ তিনি সিডন-হ্যামে এক বিদায় সভার আয়োজন করলেন।

কথা ছিল আমরা সমস্ত দিন সেখানে কাটাব। সেখানে কয়েকটি খবরের কাগজের পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অকস্মাৎ একটি পৃষ্ঠার এক কোণে "ভারতীয়দের ভোটাধিকার" শীর্ষক একটি সংবাদ আমার চোখে পড়ল। সেই সময় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মুখে বিবেচনার্থ একটি বিল পেশ করা হয়েছিল

এবং তদনুযায়ী ভারতীয়দের নাটালের আইন সভার সদস্য নির্বাচনের অধিকার হরণ করা হচ্ছিল। সংবাদপত্রে এই বিষয় সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এই বিলটি সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না এবং দেখা গেল যে উপস্থিত অপরাপর অতিথিবৃন্দও এ ব্যাপারে আমারই মতো অজ্ঞ।

আবতুল্লা শেঠকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিলেন,—"এ সব ব্যাপারে আমরা কি বুঝব? আমরা কেবল আমাদের ব্যবসার লাভ-ক্ষতির কথাই বুঝি।" আমি কিন্তু দেশে ফেরার উপক্রম করছিলাম বলে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা ব্যক্ত করতে ইতস্তত বোধ করছিলাম। আমি শেঠজীকে কেবল বললাম, "এ বিল আইনে পরিণত হলে আমাদের কপালে আরও অনেক তুর্ভোগ আছে। এ বিল আমাদের আত্মসম্মান-বোধের মূলে কুঠারাঘাত করবে।"

অন্যান্য অতিথিরা অতীব মনযোগ সহকারে আমাদের আলোচনা শুনছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "এ ব্যাপারে কি করা উচিত তা বলব? আপনি এই জাহাজে দেশে যাওয়া বন্ধ রাখুন এবং এখানে আরও এক মাস থাকুন। তাহলে আপনার নির্দেশ মতো আমরা লড়াই করব।" অন্যান্য সকলে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কাজেই আমার পক্ষে আর নাটাল ছাড়া সম্ভব হল না। ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে আমাকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। এইভাবে আমি নাটালে বসবাস আরম্ভ করলাম। উপনিবেশ

সচিবের মনে সাড়া জাগাবার জন্য অবিরাম আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এর জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়া আবশ্যক মনে হল। আমি এ সম্বন্ধে শেঠ আবদুল্লা এবং অন্যান্য মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম এবং সকলে মিলে একটি স্থায়ী জন-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এইভাবে ২২শে মে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের জন্ম হল।

: ২৩ :

তিন পাউণ্ড কর

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নাটালের ইউরোপীয়রা সে দেশে আখ চাষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে বলে বুঝতে পারলেন। এবং সেইজন্য তাঁদের মজুরের প্রয়োজন পড়ল। নাটালের জুলুরা এ কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল বলে বাইরের শ্রমিক ছাড়া আখের চাষ করা এবং তা থেকে চিনি উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল না। নাটাল সরকার তাই ভারত সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করে ভারতীয় মজুর সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করলেন। এই সব শ্রমিকদের নাটালে পাঁচ বৎসর কাজ করার জন্য চুক্তি-পত্রে সই করতে হত। মেয়াদ পার হলে তাদের নাটালেই বসবাস করার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং সেখানে কোন জমি কিনলে তার উপর তাদের পরিপূর্ণ অধিকাব থাকত। এই সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের মজুর রূপে সংগ্রহ করা হত।

ভারতীয়রা ওখানে গিয়ে আশাতিরিক্ত উন্নতি করতে লাগল। তারা প্রচুর শাকসব্জী উৎপাদন করত। তারা সে দেশে ভারতীয় শাকসব্জী চাষের প্রবর্তন করল এবং স্থানীয় সব্জীও প্রচুর উৎপাদন করতে লাগল। তারা সেখানে আমের গাছ লাগান প্রবর্তন করল। তাদের কর্মোদ্যম কেবল কৃষিকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। তারা ব্যবসা ক্ষেত্রেও প্রবেশ করল। তারা বাড়ী তৈরী করার উপযুক্ত জমি কিনল এবং অনেকেই মজুরের অবস্থা থেকে ঘর বাড়ী ও জমির মালিকের পর্যায়ে উন্নীত হল। ভারতবর্ষ থেকে মজুরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্যবসাদাররাও এলেন এবং স্থায়ী ব্যবসায়ীরূপে সে দেশে রয়ে গেলেন।

শ্বেতাঙ্গ বণিকরা এতে আতঙ্ক বোধ করলেন। ভারতীয় শ্রমিকদের আগমনকে অভিনন্দিত করার সময় তাঁরা তাদের ব্যবসায়-দক্ষতার কথা জানতেন না। খুব বেশী হলে তাদের স্বাধীন কৃষক হিসাবে বরদাস্ত করা যেতে পারে; কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরদাস্ত করা অসম্ভব।

এর পরিণামে ভারতীয়দের প্রতি বিরোধিতার বীজ বপন করা হল। আরও নানা কারণে এ বৃত্তি পরিপুষ্ট হল। এই বিরোধিতা তাই এবার আইনের মাধ্যমে ব্যক্ত হল। ব্যবস্থা পরিষদে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের উপর তিন পাউণ্ড কর বসানর এক প্রস্তাব করা হল।

আমরা এই কর ধার্য করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করে দিলাম। ভারতীয় সমাজ এ আন্দোলন

পরিত্যাগ করলে এবং কংগ্রেস এ আন্দোলনে বিরতি দিয়ে কর ধার্য করার প্রস্তাবকে অবধারিত বলে মেনে নিলে আজও চুক্তিবদ্ধ হয়ে আগত ভারতীয় শ্রমিকদের উপর এই কর ধার্য করা হত। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ এবং সমগ্র ভারতের পক্ষে এ ব্যাপার এক নিদারুণ কলঙ্ক স্বরূপ হত।

এত দিনে আমার তিন বৎসর আফ্রিকা বাস হয়ে গেছে। আমাব জন সাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা প্রয়োজন ছিল এবং তাদেরও আমাকে ভালভাবে জানা দরকার ছিল। অনেক দিন সে দেশে থাকার পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি ছয় মাসের জন্য বাড়ী যাবার ছুটি চাইলাম। এরই মধ্যে আমার পশার বেশ জমে উঠেছিল এবং আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার স্বদেশবাসীরা এখানে আমার উপস্থিতি চায়। কাজেই ভাবলাম যে একবার দেশে গিয়ে স্ত্রী ও ছেলে-পিলেদের নিয়ে এসে এখানে পাকাপোক্ত ভাবে বসবাস করার বন্দোবস্ত করা যাবে। আমি এও চিন্তা কবলাম যে দেশে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচার করে ভারতের জনমতকে অনুকূল করা যাবে ও এই ভাবে কিছুটা জনসেবা হবে।

পঞ্চম খণ্ড

ভারতবর্ষে

ঃ ২৪ ঃ

ভারত ভ্রমণ

বোম্বাই-এ না থেমে আমি সোজা রাজকোট চলে গেলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করার প্রস্তুতি করতে লাগলাম। পুস্তিকাটি লিখে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করতে এক মাস সময় লাগল। এর মলাট সবুজ রঙের ছিল বলে পরে এর নাম 'সবুজ পুঁথি' হয়েছিল। পুস্তিকাটিতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নিপীড়িত অবস্থার বর্ণনা করেছিলাম। দশ হাজার পুস্তিকা ছাপিয়ে ভারতের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠান হয়েছিল। পুস্তিকাটির বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার রয়টার তারযোগে লণ্ডনে পাঠিয়েছিল এবং লণ্ডন থেকে তার সারমর্ম আবার রয়টার কর্তৃক নাটালে প্রেরিত হয়। এই তারবার্তাটি ছাপাতে তিন লাইনের বেশী স্থান লাগে নি। নাটালের ভারতীয়দের প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণের আমি যে বর্ণনা করেছিলাম এই তারবার্তাটি তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতিরঞ্জিত সংস্করণ। আমার মূল রচনায় এ জাতীয় অতিরঞ্জন ছিল না। নাটালে এর যে প্রতিক্রিয়া হয়, পরে তা বর্ণনা করব। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করল।

এই সব পুস্তিকা ডাকে পাঠান সহজ ব্যাপার ছিল না। এগুলিকে মুড়ে ডাকে দেবার উপযুক্ত করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাই আমি এক অপেক্ষাকৃত

সহজ পন্থার শরণ নিলাম। আমি আমাদের পাড়ার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে একত্র করে সকালে যখন তাদের স্কুলে যাবার তাড়া থাকে না, তখন তাদের দুই থেকে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করার কথা বললাম। তারা এতে সানন্দে রাজী হয়ে গেল। তাদের এই সহায়তার জন্য আমি আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করলাম এবং পুরস্কার স্বরূপ আমি যে সব পুরাতন ডাক টিকিট সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম। অতি অল্পসময়ের মধ্যে তারা এ কাজ শেষ করে ফেলল। ছোট শিশুদের দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করানর সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। সেদিনকার সেই ছোট্ট বন্ধুদের ভিতর দু' জন আজ আমার সহকর্মী।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের নগরসমূহে সভাসমিতি দ্বারা জনমত সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং আমি এ জন্য বোম্বাই নগরীকে প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করলাম। বোম্বাই এবং পুণার পর আমি মাদ্রাজ গেলাম এবং সেখান থেকে কলকাতা। সেখানে আমি ডারবান থেকে নিম্ন মর্মে তারবার্তা পেলাম: "পার্লামেণ্ট জানুয়ারীতে বসছে। শীঘ্র ফিরে আসুন।"

অতএব ডিসেম্বরের প্রথমে আমি দ্বিতীয় বার দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে চললাম। আমার স্ত্রী, দুই পুত্র এবং বিধবা ভগ্নীর একমাত্র পুত্রও আমার সঙ্গে চলল। একই সঙ্গে "নাদেরী" নামক অপর একটি জাহাজও ডারবানের উদ্দেশ্যে রওনা হল। দাদা আবদুল্লা এই কোম্পানীর এজেন্ট। দুই জাহাজের মোট যাত্রীসংখ্যা প্রায় আট শ' হবে এবং এর অর্ধেক ট্রানস্‌ভালের যাত্রী।

ষষ্ঠ খণ্ড

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন

ঃ ২৫ ঃ

ঝড়ের মুখে প্রত্যাবর্তন

জাহাজ দু'টি ১৮ই ডিসেম্বর বা তার কাছাকাছি কোন এক দিন ডারবান বন্দরে নোঙর করল। ডাক্তার দ্বারা যাত্রীদের আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করার পূর্বে কোন যাত্রীকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন বন্দরে নামতে দেওয়া হয় না। জাহাজে কোন ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত যাত্রী থাকলে জাহাজটিকে কিছু দিনের জন্য সকলের সম্পর্ক রহিত অবস্থায় এক দিকে রেখে দেওয়া হত। আমরা বোম্বাই থেকে রওনা হবার সময় সেখানে প্লেগের প্রকোপ চলছিল বলে আমাদের হয়ত এইভাবে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে আশঙ্কা হচ্ছিল। বন্দরের চিকিৎসক এসে আমাদের পরীক্ষা করে গেলেন। তিনি আমাদের পাঁচ দিন অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। কারণ তাঁর মতে প্লেগের বীজাণু খুব বেশী হলে তেইশ দিন জীবিত থাকে। অতএব আমাদের জাহাজকে বোম্বাই ছাড়ার ত্রয়োবিংশ দিবস পর্যন্ত আলাদা থাকার আদেশ দেওয়া হল। তবে নিছক স্বাস্থ্য রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

ডারবানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা আমাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপার নিয়ে খুব আন্দোলন করছিলেন। কয়েক দিন আমাদের

বন্দরে নামা মুলতবী রাখার পিছনে শ্বেতাঙ্গদের এই আন্দোলনও ছিল। শহরের নিত্যকার ঘটনাবলী সম্বন্ধে দাদা আবদুল্লা অ্যাণ্ড কোম্পানী আমাদের নিয়মিত ভাবে খবর দিচ্ছিলেন। শ্বেতকায় অধিবাসীরা প্রত্যহ বিশাল সভার আয়োজন করছিলেন। এক দিকে ছিল মুষ্টিমেয় দরিদ্র ভারতবাসী ও তাঁদের অল্প কয়েকজন ইংরেজ মিত্র এবং অন্য দিকে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সংখ্যা, শক্তি, শিক্ষা ও সম্পদে বহুগুণ বলশালী শ্বেতাঙ্গরা। নাটাল সরকারের কাছ থেকে প্রকাশ্যে সহায়তা পাবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিও তাঁদের সপক্ষে ছিল বলা যায়।

যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য আমরা জাহাজের উপরই নানাবিধ খেলাধূলার আয়োজন করেছিলাম। আর ঐ সব আনন্দানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেও আমার মন পড়েছিল ডারবানের ঐ লড়াই-এ। কারণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলাম স্বয়ং আমি। আমার বিরুদ্ধে দুই দফা অভিযোগ ছিলঃ

(১) ভারতে থাকা কালীন আমি নাটালের শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে অহেতুক কুৎসা রটনা করেছি।

(২) নাটালকে ভারতবাসীদের দ্বারা ছেয়ে ফেলার জন্য আমি বিশেষ ভাবে এই দুই জাহাজ বোঝাই ভারতবাসী নিয়ে এসেছি।

আমি কিন্তু একেবারেই নিরপরাধ ছিলাম। কাউকে আমি নাটালে আসার জন্য প্ররোচিত করি নি। যাত্রীরা জাহাজে চড়ার সময় আমি তাদের কাউকে চিনতাম না। আর জনকয়েক আত্মীয় ছাড়া আমি ঐ কয়েক শত যাত্রীর ভিতর এক জনেরও নাম

ঠিকানা জানতাম না। এবং ভারতে থাকা কালীন নাটালের শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে আমি এমন কোন কথা বলি নি যা ইতিপূর্বে নাটালে উচ্চারিত হয় নি। তা ছাড়া আমি যে সব অভিযোগ করেছিলাম তার সপক্ষে সথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল।

এইভাবে অলস গতিতে দিন কাটতে লাগল। তেইশ দিন শেষ হবার পর জাহাজ তুটিকে জাহাজ-ঘাটায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল এবং যাত্রীরাও বন্দরে নামার আজ্ঞা পেলেন।

জাহাজ তুটি জাহাজ-ঘাটায় ভিড়বার পর যাত্রীরা তীরে নামতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত এসকম্ব নামে মন্ত্রীসভার জনৈক সদস্য কাপ্তানের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে শহরের শ্বেতাঙ্গরা আমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত বলে আমার জীবনের আশঙ্কা ছিল। এইজন্য তাঁর মতে কাপ্তান মহোদয় আমাকে যেন সন্ধ্যার পর তীরে নামার পরামর্শ দেন। কারণ সে সময় পোর্ট সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীযুক্ত টাটুম আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করবেন। কাপ্তান মহোদয় আমাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করার পর আমি তদনুযায়ী আচরণ করা স্থির করলাম। কিন্তু এই ঘটনার আধ ঘণ্টা পরই শ্রীযুক্ত লাফ্‌টন নামে ডারবানের ভারতীয় সমাজের জনৈক সুহৃদ কাপ্তান মহোদয়কে এসে বললেন, "শ্রীযুক্ত গান্ধীর আপত্তি না থাকলে আমি তাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আর জাহাজ কোম্পানীর এজেণ্টদের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে আমি আপনাকে বলতে পারি যে আপনি শ্রীযুক্ত এসকম্বের নির্দেশ মানতে বাধ্য নন।" এরপর তিনি আমাব কাছে এসে বললেন, "আপনার

যদি ভয় না করে, তাহলে আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই যে শ্রীমতী গান্ধী ও শিশুরা গাড়ীতে করে রুস্তমজীর বাড়ীতে যান এবং আপনি ও আমি পদব্রজে ওঁদের অনুসরণ করি। আপনি যে চোরের মতো রাত্রে শহরে প্রবেশ করবেন এ আমার অভিপ্রেত নয়। আমার তো মনে হয় না যে আপনার গায়ে হাত দেবার কোন আশঙ্কা আছে। এখন সবাই শান্ত। শ্বেতাঙ্গরা সকলে চলে গেছে। তবে যাই হোক আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনার গা ঢাকা দিয়ে শহরে প্রবেশ করা উচিত নয়।" আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম। আমার স্ত্রী ও ছেলেরা নিরাপদে রুস্তমজীর বাড়ীতে চলে গেলেন। কাপ্তান সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি শ্রীযুক্ত লাফ্‌টনসহ তীরে নামলাম। জাহাজ-ঘাটা থেকে রুস্তমজীর নিবাস ছিল প্রায় দুই মাইল দূরে।

তীরে অবতরণ করা মাত্র কয়েকটি ছেলে আমাকে চিনতে পেরে "গান্ধী, গান্ধী" বলে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জন ছয়েক লোক কোথা থেকে হাজির হয়ে ঐ চিৎকারের সঙ্গে যোগ দিল। ভীড় বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত লাফ্‌টন একটি রিক্‌সা ডাকলেন। আমি রিক্‌সায় চড়া পছন্দ করতাম না। এই আমার প্রথম রিক্‌সা চড়ার অভিজ্ঞতা। কিন্তু ছেলে-গুলি কিছুতেই আমাকে রিক্‌সায় চড়তে দেবে না। তারা রিক্‌সার চালক ছেলেটির প্রাণ নাশের ভয় দেখাল এবং সে তাই দৌড় মারল। আমরা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও বাড়তে লাগল এবং অবশেষে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হল। তারা প্রথমে শ্রীযুক্ত লাফ্‌টনকে ধরে রাখল এবং আমরা পরস্পরের

কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। তারপর আমার উপর পাথর, ইট এবং পচা ডিমের বৃষ্টি হতে লাগল। একজন আমার পাগড়িটি খুলে নিল এবং আর সকলে আমাকে কিল, চড় ও লাথি মারতে লাগল। আমার মাথা ঘুরতে লাগল এবং আমি একটি বাড়ীর রেলিং ধরে হাঁপাতে লাগলাম। কিন্তু সেখানে দাঁড়ানও অসম্ভব হয়ে উঠল। তারা আমাকে ঘুষি-চড়ে জর্জরিত করে তুলল। ঘটনাক্রমে পুলিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্টের স্ত্রী ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি আমাকে চিনতেন। সেই সাহসী মহিলা ঐ মারমুখী জনতার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর ছাতা খুলে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। তিনি ভিড়ের সামনে ঐভাবে আমাকে আগলিয়ে দাঁড়ানর জন্য জনতার রোষের হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পেলাম। কারণ শ্রীমতী আলেক্‌জেণ্ডারকে আঘাত না করে আমাকে ঘুষি মারা সম্ভবপর ছিল না।

ইতিমধ্যে জনৈক ভারতীয় যুবক এই ঘটনা দেখে থানায় খবর দিতে ছুটেছিল। পুলিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট আলেক্‌জেণ্ডার সাহেব আমাকে চারধার থেকে ঘিরে নিরাপদে আমার গন্তব্য স্থলে পাঠাবার জন্য কয়েক জন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা ঠিক সময় হাজির হল। রাস্তাতেই থানা। সেখানে পৌঁছাতে সুপারইনটেন্‌ডেন্ট সাহেব আমাকে থানায় আশ্রয় নিতে বললেন ; কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি বললাম, "ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে শান্ত হয়ে যাবে। ওদের ন্যায়বোধের উপর আমার আস্থা আছে।" এইভাবে পুলিশ প্রহরায় আমি আর কোন দুর্ঘটনায় পতিত না

হয়ে রুস্তমজীর বাড়ীতে উপনীত হলাম। আমার দেহের অনেক জায়গা আঘাতের জন্য ফুলে গেলেও রক্তপাত হয়েছিল মাত্র এক জায়গা থেকেই। জাহাজের চিকিৎসক মহাশয় সেখানে ছিলেন এবং তিনি সাধ্যমত আমার চিকিৎসা করলেন।

ঘরের পরিবেশ শান্ত ছিল ; কিন্তু বাইরে শ্বেতাঙ্গরা রুস্তমজীর বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল। রাত্রি হয়ে আসছিল এবং সেই ক্রুদ্ধ জনতা থেকে থেকে গর্জন করে উঠছিল, "আমরা গান্ধীকে চাই।" দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন পুলিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব ইতিমধ্যে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি উত্তেজিত জনতাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি কোনরকম হুমকি দেবার পরিবর্তে তাদের সঙ্গে রসিকতা করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য এতে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হয় নি। তিনি আমাকে নিম্নলিখিত মর্মে এক সংবাদ পাঠালেন: "আপনি যদি আপনার বন্ধুর বাড়ী, সম্পত্তি ও আপনার পরিবারস্থ সকলকে রক্ষা করতে চান, তবে আমার পরামর্শ মত এখান থেকে ছদ্মবেশে চলে যান।"

সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্টের উপদেশানুযায়ী আমি ভারতীয় কনেস্টবলের উর্দি পরে মাথায় মাদ্রাজি ধরণের পাগড়ি বাঁধলাম। তার উপর শিরস্ত্রাণ স্বরূপ একটি লোহার চাদরের টুকরা রইল। আমার সঙ্গে দুজন ডিটেক্‌টিভ অফিসার চললেন। এঁদের মধ্যে একজন মুখে রঙ মেখে ভারতীয় বণিকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। অপর জন কি সেজেছিলেন তা ভুলে গিয়েছি। একটি সরু গলি দিয়ে আমরা কাছের একটি দোকানে হাজির

হই এবং দোকানের গুদামে সাজান বস্তাগুলির মধ্য দিয়ে গুঁড়ি মেরে দোকানের সদর দরজা দিয়ে বাইরে আসি। তারপর ভিড়ের পাশ কাটিয়ে আমরা বড় রাস্তার এক ধারে আমাদের জন্য রাখা একটি গাড়ীতে উঠে পড়লাম। এই গাড়ী আমাদের সেই থানায় পৌঁছে দিল, যেখানে কয়েক ঘন্টা পূর্বে শ্রীযুক্ত আলেক্‌জেণ্ডার আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। যাই হোক থানায় পৌঁছে আমি শ্রীযুক্ত আলেক্‌জেণ্ডার এবং তাঁর দুই ডিটেক্‌টিভ অফিসারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

আমি যখন এইভাবে পালাচ্ছিলাম শ্রীযুক্ত আলেক্‌জেণ্ডার একটি গান গেয়ে উত্তেজিত জনতার মনযোগ তাঁর দিকে আকর্ষণ করে রেখেছিলেন। তিনি গাইছিলেন ঃ

"তেতুল গাছের ফাঁসি কাঠে
ঝুলাও বুড়ো গান্ধীটাকে।"

আমার নিরাপদে থানায় পৌঁছে যাবার সংবাদ তাঁকে দেবার পর তিনি এইভাবে জনতার কাছে সে খবর ফাঁস করলেন,—"আরে তোমাদের আসামী তো পাশের এক দোকানের ভিতর দিয়ে পগার পার হয়েছে। এখন সকলের বাড়ী যাওয়াই ভাল।" এ খবরে কেউ কেউ চটে উঠল, কেউ কেউ হাসল এবং অনেকে আবার এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী হল না।

পুলিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট বললেন, "বেশ তোমাদের যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে তোমাদের মধ্যে দুই একজন আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে চল। তারা যদি গান্ধীকে খুঁজে পায় তাহলে সানন্দে আমি তাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ

করব। কিন্তু গান্ধীকে খুঁজে না পাওয়া গেলে তোমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমার মনে হয় তোমরা শ্রীযুক্ত গান্ধীর স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের কোন ক্ষতি করতে চাও না।"

জনতা রুস্তমজীব বাড়ী খানাতল্লাসী কবার জন্য তাদের প্রতিনিধি পাঠাল। শীঘ্র তারা আশাহত হবার সংবাদ নিয়ে ফিরে এল এবং অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। চলে যাবার সময় তাদের অধিকাংশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট যেরকম কুশলতাপূর্বক এ ঘটনাকে সামলে নিলেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তবে কেউ কেউ আবার রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে বাড়ীর পথ ধরল।

তদানীন্তন উপনিবেশ সচিব শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন নাটাল সরকারকে এক তারবার্তা পাঠিয়ে আমার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন। শ্রীযুক্ত এসকম্ব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে আমার আঘাতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "বিশ্বাস করুন আপনার দেহের সামান্য একটু আঘাতও আমার মনোবেদনার কারণ হয়। আপনার অবশ্য শ্রীযুক্ত লাফ্‌টনের পরামর্শ গ্রহণ করে চূড়ান্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হবার অধিকার ছিল। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আপনি যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, তাহলে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটতই না। আপনি যদি আততায়ীদের সনাক্ত করতে পারেন আমি তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত আছি। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনেরও এই রকম ইচ্ছা।"

এর উত্তরে আমি বললাম, "আমি কাউকে সাজা দিতে

চাই না। ওদের দুই এক জনকে আমি হয়ত সনাক্ত করতে পারব কিন্তু তাদের সাজা দিয়ে কি লাভ? তা ছাড়া আমি আক্রমণকারীদের দোষ দিই না। তাদের এই কথা বোঝান হয়েছিল যে আমি ভারতবর্ষে এখানকার শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত এবং ক্ষতিকারক বিবৃতি দিয়েছি। এই খবর পাবার পর তাদের এভাবে উত্তেজিত হওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই। এইজন্য এখানকার নেতৃবৃন্দ এবং যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনিও দায়ী। আপনারা জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন; কিন্তু আপনারাও রয়টারের খবরে বিশ্বাস করে ধরে নিয়েছিলেন যে আমি নিশ্চয় অতিরঞ্জনের অপরাধে অপরাধী। আমি কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই না। আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি যে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হলে ওরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে।"

শ্রীযুক্ত এসকম্ব বললেন, "এ কথা লিখে দিতে আপনার আপত্তি নেই তো! কারণ আমাকে আবার শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের কাছে এই মর্মে তার করতে হবে। তবে এখনই আপনি এটা লিখে দিন, এ কথা আমি বলছি না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করার পূর্বে আপনি শ্রীযুক্ত লাফ্‌টন ও আপনার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। তবে আমি স্বীকার করছি যে আপনি যদি আপনার আক্রমণকারীদের শাস্তি দেবার অধিকার প্রয়োগ না করেন, তাহলে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করা হবে এবং তা ছাড়া এতে আপনার সম্মানও বৃদ্ধি পাবে।"

আমি বললাম, "ধন্যবাদ। আমার কারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। আপনার কাছে আসার পূর্বেই আমি এ সিদ্ধান্ত করেছিলাম। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা না করা আমার বিশ্বাসের অঙ্গ। এই মুহূর্তেই আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা লিখে দিচ্ছি।" আমি তাঁর কাছে আমার লিখিত বিবৃতি দাখিল করলাম।

জাহাজ-ঘাটায় নামার দিন "দি নাটাল এড্ভার্টাইজারের" জনৈক প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি অনেক প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তর দানপ্রসঙ্গে আমি আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল, তা খণ্ডন করতে সমর্থ হই।

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এবং আমার আক্রমণকারীদের অভিযুক্ত করার অনিচ্ছা—উভয়ে মিলে এমন এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করল যে ডারবানের ইউরোপীয়রা তাঁদের পূর্ব আচরণের জন্য লজ্জিত হলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি আমাকে নিরপরাধ বলে রায় দিয়ে জনতার নিন্দা করল। এইভাবে এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত আমাদের দাবীর পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হল। এই ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করল এবং আমার কাজও সহজতর হল। তিন চার দিনের মধ্যে আমি আমার ঘরে গেলাম এবং সেখানে গুছিয়ে বসতে আর বেশী সময় লাগে নি।

ঃ ২৬ ঃ

সরল জীবন

প্রত্যেক মাসে ধোপাকে বেশ মোটা টাকা দিতে হত। আর তা ছাড়া তার সময়নিষ্ঠার কোন বালাই ছিল না বলে

দুই তিন ডজন শার্ট ও টাইএও আমার কুলাত না। রোজ একটি কলার দরকার হত এবং প্রতিদিন না হলেও এক দিন অন্তর শার্ট বদলানর দরকার পড়ত। এর ফলে দ্বিগুণ খরচ পড়ত এবং আমার কাছে এটা অপ্রয়োজনীয় মনে হত। তাই এই খরচ কমাবার জন্য আমি কাপড় কাচার সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করলাম। কাপড় ধোলাই সম্বন্ধীয় একখানি বই কিনে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা করলাম এবং আমার স্ত্রীকেও এ কাজ শেখালাম। এতে আমার কাজ একটু বাড়লেও কাজের অভিনবত্ব আনন্দের কারণ হল।

প্রথম যে কলারটি নিজের হাতে কেচেছিলাম, তার কথা আমি ভুলব না। এতে মাড় বেশী পড়েছিল এবং ইস্তিরিটিও ভালভাবে গরম করা হয় নি। কাপড় পুড়ে যাবার ভয়ে কলারটিকে আমি ঠিক মতো ইস্তিরি করি নি। ফলে, কলার বেশ শক্তভাবে খাড়া থাকলেও ক্রমাগত এর গা থেকে অতিরিক্ত এরারুটের গুঁড়ো পড়ছিল। এই কলার পরেই আমি আদালতে গেলাম ও আমার সহকর্মী ব্যারিস্টাররা এই দেখে আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তবে ঐ সময় থেকেই বিদ্রূপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার মতো শক্তি আমার মনে জন্মেছিল।

আমি বললাম, “দেখুন, নিজের হাতে কাপড় ধোয়ার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই এ ভাবে এরারুটের গুঁড়ো ঝরছে। কিন্তু এতে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না আর তা ছাড়া আপনারাও এর জন্য কত মজা পাচ্ছেন।”

জনৈক মিত্র বললেন, “আচ্ছা, দেশে তো ধোপার অভাব নেই।”

আমি জবাব দিলাম, "ধোপার বাবদ বেশ মোটা রকম টাকা বেরিয়ে যায়। একটি কলার কাচার খরচ নতুন একটি কেনারই মতো পড়ে। অধিকন্তু এর জন্য চিরকাল তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এর চেয়ে নিজের কাপড়-চোপড় নিজেরই হাতে কেচে নেওয়া ভাল নয় কি ?"

এইভাবে আমি নাপিতের দাসত্ববন্ধন থেকেও মুক্ত হলাম। বিলাতফেরত প্রতিটি লোক সে দেশ থেকে অন্ততঃ নিজের দাড়ি কামাতে শিখে আসে। কিন্তু আমি যতদূর জানি চুল ছাঁটার বিদ্যা কেউ শিখে আসে না। আমাকে তা-ও শিখতে হয়েছিল। একদিন আমি প্রিটোরিয়ার জনৈক ইংরেজ নাপিতের কাছে গিয়েছিলাম। সে উপেক্ষাভরে আমার চুল কেটে দিতে অস্বীকার করল। আমার মনে আঘাত লাগলেও তৎক্ষণাৎ আমি একটি কাঁচি কিনে ফেললাম এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল নিজেই ছেঁটে নিলাম। সামনের চুল মোটামুটি এক রকম করে কাটলেও পিছনের দিক একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আদালতের বন্ধুবর্গ আমার এই অবস্থা দেখে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

"তোমার চুলে কি হল গান্ধী ? ইঁদুরে খেয়ে গেছে নাকি ?"

আমি বললাম, "তা নয়। শ্বেতাঙ্গ ক্ষৌরকার আমার কৃষ্ণবর্ণ কেশ স্পর্শ করতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং যত খারাপই হক না কেন, নিজের চুল নিজেই ছেঁটে নিয়েছি।"

বন্ধুরা এ উত্তরে বিস্মিত হলেন না। আমার চুল কাটতে অস্বীকার করায় নাপিতের দোষ ছিল না। কালা আদমীদের কাজ করলে তার সব গ্রাহক হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। আমরাই

তো নিজেদের দেশে আমাদের নাপিতকে আমাদেরই "অস্পৃশ্য" ভাইদের ক্ষৌরকর্ম করতে দিই না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় পুরস্কার আমি একবার নয়, বহুবারই পেয়েছি। এ যে আমাদেরই পাপের শাস্তি—এই বিশ্বাস আমাকে এর জন্য ক্রুদ্ধ হবার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

ঃ ২৭ ঃ

একটি ঘটনার স্মৃতি ও অনুতাপ

ডারবানে আইন ব্যবসায় চালাবাব সময় আমার কেরানীরা সময় সময় আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। এঁদের ভিতর হিন্দু এবং খ্রীষ্টান দুই-ই ছিলেন। প্রদেশ হিসাবে এদের বিভাজন করলে বলতে হবে যে এঁদের মধ্যে গুজরাতী এবং তামিল দুই প্রদেশের বাসিন্দাই থাকতেন। এদের একান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া কখনও অন্য দৃষ্টিতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। জনৈক খ্রীষ্টান কেরানী তথাকথিত অস্পৃশ্য পরিবারের ছিলেন।

আমাদের বাড়ীর ঘরগুলি পাশ্চাত্য ধরণের ছিল এবং এর ভিতর থেকে ময়লা জল বেরিয়ে যাবার কোন পথ ছিল না। প্রত্যেক কামরায় তাই প্রস্রাবের পাত্র ছিল। এইগুলি কোন চাকর বা মেথরকে দিয়ে পরিস্কার করান'র পরিবর্তে আমি বা আমার স্ত্রী এ কাজটি করতাম। যেসব কেরানী একেবারে ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা স্বভাবতই নিজেদের পাত্র নিজেরাই পরিস্কার করে নিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টান কেরানীটি নতুন এসেছিলেন কাজেই তাঁর পাত্র সাফ করা আমাদের কর্তব্য ছিল। আমার স্ত্রী

আর সব ঘরের পাত্র পরিস্কার করে নিলেও একজন "অস্পৃশ্য" কর্তৃক ব্যবহৃত পাত্র পরিস্কার করা তাঁর পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত হল এবং তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধল। আমি সেই পাত্র পরিস্কার করব—এ তাঁর পক্ষে অসহ্য, অথচ এদিকে তিনিও সেটি পরিস্কার করবেন না। আজও আমার সে দৃশ্য স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে। কস্তুরবা আমার উপর তর্জন গর্জন করে চলেছেন, ক্রোধে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ এবং গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছে। এই অবস্থায় তিনি সেই পাত্র হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমি ছিলাম নিষ্ঠুর স্বভাবের স্বামী। আমি নিজেকে তাঁর শিক্ষক মনে করতাম এবং তাই অন্ধ ভালবাসা দ্বারা চালিত হয়ে তাঁর সংশোধন করার জন্য তাঁর উপর উৎপীড়ন করতাম।

পাত্রটি নিয়ে গিয়েই তিনি নিস্তার পেলেন না। সাফাই-এর কাজ তাঁকে হাসিমুখে করতে হবে—আমি এই নির্দেশ দিলাম। অতএব গলা উঁচু পর্দায় তুলে আমি ঘোষণা করলাম, "আমার বাড়ীতে এ সব ঝকমারি চলবে না।"

কথাগুলি তাঁর বুকে তীরের মত গিয়ে বিঁধল। তিনিও পাল্টা চিৎকার করে উঠলেন, "তোমার বাড়ী তোমারই থাক্। আমাকে এবার বিদায় দাও।" আমার কাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হল এবং আমার হৃদয় থেকে করুণার শেষ বিন্দুটুকুও অন্তর্হিত হল। আমি সেই অসহায় নারীর হাত চেপে ধরে তাঁকে টানতে টানতে বাড়ীর দরজার দিকে নিয়ে চললাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল দরজা খুলে তাঁকে বাইরে বার করে দেওয়া। তাঁর দুই চক্ষে অজস্র ধারায় অশ্রু বইছিল এবং তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তোমার বুদ্ধি-

শুদ্ধি এবং লজ্জা-শরম সবই কি লোপ পেয়েছে? তুমি এইভাবে আত্মবিস্মৃত হলে আমি যাব কোথায়? এখানে কি আমার মা বাবা বা এমন কোন আত্মীয় আছেন যাঁর বাড়ীতে গিয়ে আমি মাথা গুঁজব? তোমার স্ত্রী বলে তুমি মনে কর—তোমার লাথি-ঝাঁটা সবই আমাকে সহ্য করতে হবে। ভগবানের দোহাই মাথা ঠাণ্ডা করে দরজাটা ভেজিয়ে দাও। এই কেলেঙ্কারি যেন লোকের চোখে না পড়ে।”

আমি খুব বীরের মত মুখভঙ্গী করলেও মনে মনে লজ্জা পাচ্ছিলাম। তাই দরজায় খিল দিলাম। আমার স্ত্রীর পক্ষে আমাকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আমিও তেমনি তাঁকে ত্যাগ করতে পারি না। আমাদের মধ্যে বহুবার বিবাদ হলেও শেষ পর্যন্ত আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার স্ত্রী তাঁর অতুলনীয় সহ্যশক্তির জন্য প্রত্যেকবারই জয়ী হয়েছেন।

ঃ ২৮ ঃ

বুয়র যুদ্ধ

এবার আমি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বহু ঘটনার কথা বাদ দিয়ে একেবারে বুয়র যুদ্ধ প্রসঙ্গে উপনীত হব।

“দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ” নামক পুস্তকে আমি এই সময়ের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এখানে তার আর পুনরুক্তি করলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমি ঐ

পুস্তক পাঠ করার পরামর্শ দেব। এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমার আনুগত্যই আমাকে এই যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। আমি যদি ব্রিটিশ নাগরিকের অধিকার চাই, তাহলে ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে আমার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার কার্যে অংশ গ্রহণ করা উচিত—এই ধারণা দ্বারা আমি তখন চালিত হই।

আমাদের বাহিনীতে ১,১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক ছিল এবং এদের নায়কের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এই সময় আমাদের আহতদের পৃষ্ঠে বহন করে দৈনিক কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল কুচকাওয়াজ করতে হত। আহতদের মধ্যে জেনারেল উড্‌গেটের মত সৈনিককে বহন করার সম্মানও আমরা অর্জন করেছিলাম। ছয় সপ্তাহ সেবার পর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

সেই সময় আমাদের এই সামান্য কাজের প্রভূত প্রশংসা হয় এবং এর ফলে ভারতীয় সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ঃ ২৯ ঃ

মূল্যবান উপঢৌকন

যুদ্ধের দায়িত্ব শেষ হবার পর আমার মনে হল যে এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাজ শেষ হয়েছে এবং এখন আমার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে ভারতবর্ষে। দেশের বন্ধু-বান্ধবেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন এবং আমারও মনে হচ্ছিল যে ভারতবর্ষে আমার সেবার প্রয়োজন এখানকার চেয়ে বেশী। তাই আমি

সহকর্মীদের কাছে বিদায় দেবার আবেদন জানালাম। বহু ওজর আপত্তির পর আমাকে শর্তাধীনে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। শর্ত হচ্ছে এই যে একবৎসরের মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায় আমার উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করলে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত থাকব। সর্বত্র বিদায়-সভার আয়োজন হল এবং আমাকে নানারূপ মূল্যবান উপঢৌকন দেওয়া হল। উপহার-সামগ্রী সচরাচর স্বর্ণরৌপ্য-নির্মিত হলেও এর ভিতর হীরক-নির্মিত দ্রব্য সামগ্রীও ছিল।

যেদিন সন্ধ্যায় এইসব উপহার পেলাম। সেদিন রাত্রে আমার চোখে আর ঘুম এল না। তীব্র উত্তেজনায় আমি আমার শয়ন-কক্ষে পায়চারী করে বেড়ালাম। কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারলাম না। শত শত টাকা মূলের ঐসব উপহার ছেড়ে দেওয়া কঠিন, আবার ওগুলি নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া আরও কষ্টকর।

আর যদি আমি ওসব রাখি, তাহলে আমার সন্তানদের উপর এর কি প্রভাব পড়বে? আমার স্ত্রীর মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে? তাদের সেবামূলক জীবনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। তারা বুঝছিল যে সেবা নিজেই নিজের পারিতোষিক।

আমার ঘরে কোন মূল্যবান আভরণাদি ছিল না। দ্রুতবেগে আমরা আমাদের জীবনকে সরল করে আনছিলাম। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে সোনার ঘড়ি রাখা কিভাবে সমীচীন হয়? সোনার হার বা হীরার আংটি পরা তো আমাদের পক্ষে কোনমতেই শোভন হয় না। এ ছাড়া আমি তো সকলকে স্বর্ণালঙ্কারের মোহ ত্যাগ

করার পরামর্শ দিচ্ছিলাম। তাহলে যেসব রত্নাভরণ এখন আমার কাছে এসে পড়েছে, সেগুলি নিয়ে আমি কি করব?

এসব আমাদের রাখা উচিত নয়—এই সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম। ভারতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য এইসব সম্পত্তি দিয়ে আমি একটি ট্রাস্ট গঠন করার কথা স্থির করলাম। প্রস্তাবিত ট্রাস্টের নিয়মাবলীরও মুসাবিদা রচনা করে ফেললাম এবং পার্শী রুস্তমজী ও অপর কয়েকজনকে এর অছি নিযুক্ত করার প্রস্তাব করলাম। প্রত্যূষে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবশেষে আমি এই বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে এবিষয়ে আমার স্ত্রীকে সম্মত করতে বেগ পেতে হবে। তবে ছেলেদের রাজী করতে যে অসুবিধা হবে না—এ আমি জানতাম। তাই আমি ছেলেদের আমার উকিলের পদে নিযুক্ত করতে মনস্থ করলাম।

ছেলেরা সহজেই আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তারা বলল, "এসব মূল্যবান উপঢৌকনে আমাদের প্রয়োজন নেই। এসব সমাজের কাজে দিয়ে দেওয়াই কর্তব্য। তাছাড়া কোনদিন ওসবের দরকার পড়লে আমরা কি কিনে নিতে পারব না?"

আমি উল্লসিত হয়ে তাদের বললাম, "তাহলে একথা তোমরা তোমাদের মাকে বুঝাও।"

তারা উত্তর দিল, "নিশ্চয়, মাকে বুঝান তো আমাদেরই কর্তব্য। তিনি তো এসব গয়না পরবেন না। এগুলি আমাদের জন্য রেখে দিতে চান, অথচ আমাদের এর কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে এগুলি দিয়ে দিতে আপত্তি করার আর কি কারণ থাকতে পারে?"

কিন্তু একথা বলা যত সহজ কাজটি তত সহজ নয়।

আমার স্ত্রী বললেন, "তোমার হয়ত এসবের প্রয়োজন নেই। আর তোমার ছেলেরাও এসব চাইবে না। ওরা তোমার কথায় নাচছে। আমাকে গয়নাগাটি পরতে না দেবার অর্থ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমার পুত্রবধূদের কি হবে? তারা তো গয়না পরবে। আর তা ছাড়া কাল কোন বিপদ-আপদ হবে কি না আজ তা কে বলতে পারে? এত ভালবেসে লোকে যেসব জিনিস দিয়েছে, তা ছেড়ে দিতে আমি মোটেই রাজী নই।"

এইভাবে যুক্তিতর্কের প্রবল স্রোত বয়ে গেল এবং অবশেষে চোখের জলে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। আমি কিন্তু গয়নাগাটি ফেরত দেবার ব্যাপারে দৃঢ় রইলাম। শেষ পর্যন্ত পাকে-প্রকারে তাঁর একটা সম্মতিও আদায় করলাম। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত যাবতীয় উপঢৌকন এইভাবে প্রত্যর্পণ করা হল। একটি অছি মণ্ডলী তৈরী করার দলিল সম্পাদন করে গয়নাগুলি আমার বা অছি মণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থ ব্যবহার করার জন্য ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেওয়া হল।

ভবিষ্যতে কখনও এ কার্যের জন্য আমি অনুতাপ বোধ করি নি এবং আমার স্ত্রীও ক্রমশঃ এ কার্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদের অনেক প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই—জনসেবকের কোনরকম মূল্যবান উপঢৌকন গ্রহণ করা উচিত নয়।

———

সপ্তম খণ্ড

ভারতে

ঃ ৩০ ঃ

কংগ্রেসের প্রথম অভিজ্ঞতা

ভারতবর্ষে পৌঁছে আমি কিছু দিন দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। এই বৎসর, অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্বর্গীয় দীনশা ওয়াচার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হল। বলাই বাহুল্য আমি সে অধিবেশনে যোগদান করলাম। এই আমার কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা।

আমাকে কোথায় যেতে হবে—একটি স্বেচ্ছাসেবককে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে রিপন কলেজে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা পরস্পরবিরোধী উক্তি করছিলেন। কাউকে কোন কাজের কথা বললে তিনি অপর একজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবক আবার হয়ত তৃতীয় একজনের কাছে যাবার নির্দেশ দিতেন। ফলে প্রতিনিধিদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা।

প্রতিনিধি নিবাসে নোংরামির কোন সীমা ছিল না। যত্র তত্র জল জমে ছিল। মাত্র অল্প কয়েকটি পায়খানার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাদের দুর্গন্ধের কথা মনে পড়লে আজও আমার গা ঘিন ঘিন

করে। আমি স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলাম। তাঁরা সোজা জবাব দিলেন,—"ও আমাদের কাজ নয়। ওর জন্য তো মেথর রয়েছে।" আমি একটি ঝাঁটা চাইলাম। স্বেচ্ছাসেবকটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। যাই হক, একটি ঝাঁটা যোগাড় করে আমি পায়খানাটি পরিস্কার করলাম। কিন্তু তাতে তো কেবল আমার কাজ হল। পায়খানার সংখ্যা অল্প এবং ভীড়ও বেশী। তাই ঘন ঘন পায়খানা পরিস্কার করার প্রয়োজন ছিল। অথচ আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল না।

কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হতে দুইদিন বাকী ছিল। হাতে কলমে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য আমি কংগ্রেস অফিসে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য নাম লেখাতে মনস্থ করেছিলাম। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত ঘোষাল সেবারকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। আমি ভূপেনবাবুর কাছে গিয়ে আমাকে কোন কাজ দেবার অনুরোধ জানালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কাছে তো কোন কাজ নেই। তবে ঘোষালবাবু হয়ত আপনাকে কাজে লাগাতে পারবেন। আপনি দয়া করে তাঁর কাছে যান।"

আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তিনি বললেন, "আমি আপনাকে কেবল কেরানীর কাজ দিতে পারি। তা কি আপনি করবেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "নিশ্চয় করব। আমার সাধ্যে কুলায় এমন যে কোন কাজ করতে আমি প্রস্তুত আছি।"

শ্রীযুক্ত ঘোষালের বেয়ারা তাঁর শার্টে বোতাম লাগিয়ে দিত। আমি স্বেচ্ছায় বেয়ারার ঐ কাজ করতে লাগলাম। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের চিরকালই আমি শ্রদ্ধা করি বলে এসব কাজ করতে আমি বরাবর ভালবাসি। তিনি একথা জেনে মোটেই অপ্রসন্ন হন নি। বরং তাঁকে এটুকু সেবা করছি বলে তিনি খুশীই হয়েছিলেন। আর এই ক্ষুদ্র সেবাকার্যের দ্বারা আমার অসীম উপকার হয়েছিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমি কংগ্রেসের কার্য পরিচালনবিধি বুঝতে পারলাম। আমি অধিকাংশ নেতার সঙ্গে দেখা করলাম।

স্যার ফিরোজশা আমার দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কে কখন বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সামনে এ প্রস্তাব উত্থাপন করবেন—এই নিয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। কারণ প্রত্যেকটি প্রস্তাবের সমর্থনে দীর্ঘ বক্তৃতা হত এবং এর প্রতিটিই হত ইংরেজীতে। আর এর প্রত্যেটিরই সমর্থক ছিলেন কোন না কোন বিখ্যাত নেতা। রাত্রি গভীর হয়ে আসছিল দেখে আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল। যাবার জন্য সকলের ভিতরই ব্যস্ততার লক্ষণ ফুটে উঠছিল। এগারটা বেজে গিয়েছিল। আমার কথা বলারও ছিল না। আমি ইতিপূর্বে গোখলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তিনি আমার প্রস্তাবটি পড়েছিলেন। আমি তাঁর চেয়ারের কাছে গিয়ে তাঁর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, "আমার জন্য দয়া করে কিছু করুন।"

"তাহলে কাজকর্ম সব শেষ তো?" স্যার ফিরোজশা মেহতা বললেন।

গোখলে চিৎকার করে বললেন, "না, না। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব এখনও বাকী। শ্রীযুক্ত গান্ধী অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছেন।"

স্যার ফিরোজশা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি প্রস্তাবটি দেখেছেন ?"

"নিশ্চয়।"

"ওটি আপনার পছন্দ হয় ?"

"বেশ ভাল হয়েছে প্রস্তাবটি।"

"তাহলে ওটি উত্থাপন কর গান্ধী।"

আমি কাঁপতে কাঁপতে প্রস্তাবটি পড়লাম।

গোখলে সেটি সমর্থন করলেন।

সকলে চিৎকার করে উঠলেন, "সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হল।"

শ্রীযুক্ত ওয়াচা বললেন, "প্রস্তাব সম্বন্ধে বলার জন্য তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হল গান্ধী।"

কংগ্রেসের কার্য-পরিচালন-পদ্ধতি আমার কাছে মোটেই সন্তোষনজনক মনে হয় নি। প্রস্তাবটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কেউ করেন নি। যাবার জন্য সকলেই উন্মুখ হয়েছিলেন। আর নেহাৎ গোখলে প্রস্তাবটি দেখেছিলেন বলে আর কেউই সেটি দেখার বা বোঝার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেলন না।

তাহলেও কংগ্রেস প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে—কেবল এই কারণেই আমার হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের স্বীকৃতির অর্থ সমগ্র দেশের সমর্থন লাভ—এই সত্য যে-কোন ব্যক্তির মনকে প্রসন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট।

: ৩১ :

বোম্বাইএ উপস্থিতি

গোখলের খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি বোম্বাই-এ থেকে ব্যারিস্টারি করি এবং জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করি।

আমার পেশায় আমি আশাতীত সাফল্য অর্জন করলাম। আমার দক্ষিণ আফ্রিকার মক্কেলরা আমাকে তাঁদের কাজ কর্ম দিতেন এবং আমার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা তার থেকে হয়ে যেত।

বোম্বাই-এ ঠিক যখন আমি আমার পরিকল্পনা মতো গুছিয়ে বসেছি বলে মনে হচ্ছিল, তখনই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটি অপ্রত্যাশিত তার এল। তাতে লেখা ছিল: 'চেম্বারলেনের আসার সম্ভাবনা আছে। দয়া করে অবিলম্বে ফিরে আসুন।' আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তার করে সেখানে জানালাম যে যাবার ভাড়া পেলেই আমি রওনা হব। অবিলম্বে টাকা এসে গেল এবং আমি আমার চেম্বার উঠিয়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

———

অষ্টম খণ্ড

আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়

ঃ ৩২ ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছালাম

ডারবানে পৌঁছান মাত্র দেখলাম যে হাতে মোটেই সময় নেই। আমার জন্য প্রচুর কাজ জমে রয়েছে। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার দিন ধার্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে দেবার জন্য আমাকে একটি স্মারকপত্র রচনা করতে হবে এবং সাক্ষাৎকারী দলের সঙ্গেও থাকতে হবে।

শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের বক্তব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবলেন না। তিনি বললেন, "আপনারা তো জানেনই যে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার প্রাপ্ত উপনিবেশ সমূহের উপব ব্রিটিশ সরকারের খুব বেশী নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই। আপনাদের অভিযোগ যথার্থ বলে মনে হয়। আমি এ সম্বন্ধে যতদূর পারি ব্যবস্থা অবলম্বন করব। তবে আপনারা যদি এখানকার ইউরোপীয়দের মধ্যে থাকতে চান তাহলে আপনাদের যথাসাধ্য তাদের মন জুগিয়ে চলতে হবে।

উত্তর শুনে প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্যদের শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। আমিও হতাশ হলাম। এই ঘটনা আমাদের সকলের চোখ খুলে দিল এবং আমি বুঝতে পারলাম যে আবার আমাদের গোড়া থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। সহকর্মীদের আমি অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমি বললাম, "সত্যি কথা বলতে কি আপনারা আমাকে যে কাজেব জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা এক রকম শেষ হয়ে গেছে। তবে আমার মতে আপনারা আমাকে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেও আমার ট্রানস্ভাল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হবে না। পূর্বের মতো নাটাল থেকে আমার কাজকর্ম না চালিয়ে এবার এখানে থেকে কাজ করতে হবে। এখন আর এক বৎসরের ভিতর ভারতে ফেরার কথা না ভেবে ট্রানস্ভাল সুপ্রিম কোর্টে নাম লিখিয়ে এখানে পাকাপোক্ত ভাবে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নূতন বিভাগটির সঙ্গে বোঝাপড়ার কাজ যে আমি সামলে নিতে পারব—এ বিশ্বাস আমার আছে। আর এই পন্থা গ্রহণ না করলে আমাদেব স্বদেশীয়দের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে।"

এইভাবে নবীন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। প্রিটোরিয়া এবং জোহানস্বর্গের ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অবশেষে আমি জোহানস্বর্গে আমার অফিস খোলার সিদ্ধান্ত করলাম।

: ৩৩ :

গীতা পাঠ

আমার থিওসফিস্ট্ বন্ধুরা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁদের সভায় টেনে নিতেন। থিওসফিস্ট্ মতবাদের উপর হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তাঁরা আমার কাছ থেকে হিন্দু হিসাবে কোন কোন বিষয়ে সহায়তা পাবার আশা করতেন। আমরা একটি

পাঠচক্রের মতো স্থাপন করলাম। সেখানে প্রতিদিন ধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ হত।

গীতায় আমার বিশ্বাস ছিল বলে ইতিপূর্বেই গীতার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছিল। এবার আমি এর ভিতর গভীর ভাবে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। আমার কাছে গীতার দুই একটি অনুবাদ ছিল এবং এর সাহায্যে আমি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। এ ছাড়া প্রত্যহ এর একটি বা দুটি শ্লোক মুখস্ত করা স্থির করলাম। এর জন্য আমি সকালের নিত্যকৃত্যের সময়টা কাজে লাগালাম। এতে আমার পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় লাগত, দাঁত মাজায় পনের মিনিট এবং স্নানের জন্য কুড়ি মিনিট। কাগজে গীতার শ্লোক লিখে নিয়ে আমি স্নানের ঘরের দেওয়ালে তা টাঙ্গিয়ে রাখতাম এবং প্রয়োজন মতো সেই লেখার দিকে তাকিয়ে শ্লোক মুখস্ত করতাম। নিত্য নতুন শ্লোক লিখে নিয়ে আমি স্নানের ঘরের দেওয়ালে তা টাঙ্গিয়ে রাখতাম এবং প্রয়োজন মতো সেই লেখার দিকে তাকিয়ে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতাম। আমার মনে পড়ে, এই ভাবে আমি গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত মুখস্ত করেছিলাম।

ক্রমে ক্রমে গীতা আমার কাছে সর্ববিধ আচরণের মানদণ্ড হয়ে উঠল। কর্তব্য নির্ধারণের জন্য দৈনিক গীতার উপদেশ অনুসন্ধান করা আমার স্বভাবে পরিণত হল। “অপরিগ্রহ” এবং “সমভাব” শব্দ আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করল। এই সমভাবের অনুশীলন কি ভাবে করা যায় এবং কি করে একে

স্থায়ী করা যায়—তা-ই আমার চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করেই কি আমাকে ঈশ্বরের অনুবর্তী হতে হবে? এর স্পষ্ট উত্তর পেলামঃ সব কিছু না ছাড়লে তাঁর অনুবর্তী হওয়া যায় না। তাই আমি রেবাশঙ্কর ভাইকে লিখলাম যে, যা কিছু পাওয়া যায় নিয়ে আমার জীবন-বীমার প্রিমিয়ামের টাকা দেওয়া যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বললাম, এ যাবৎ যা দেওয়া হয়েছে তা সব বরবাদ গেছে। কারণ আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ঈশ্বর আমারই মতো আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদেরও সৃষ্টি করেছেন; অতএব তিনি তাদেরও দেখবেন। আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখলাম যে, এ যাবৎ আমি যা কিছু বাঁচাতে পারতাম, তা সবই তাঁকে দিলেও ভবিষ্যতে তিনি যেন আমার কাছ থেকে আর কোন আশা না রাখেন। কারণ ভবিষ্যতে আমার যা কিছু বাঁচবে তা জনসেবার জন্যই ব্যয় করব স্থির করেছি।

ঃ ৩৪ ঃ

একটি পুস্তকের বিস্ময়কর প্রভাব

ডারবান যাবার সময় শ্রীযুক্ত পোলক নামে জনৈক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাকে একখানি বই দিয়ে বলেন, আমি যেন সেটি যাত্রাপথে পড়ি। তাঁর মনে হয়েছিল যে বইটি আমার ভাল লাগবে। বইটি হচ্ছে রাস্কিন-লিখিত "আন্‌টু দিস্ লাস্ট।"

বইটি শুরু করে শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেখে দেওয়া অসম্ভব হয়েছিল। পুস্তকখানি যেন আমাকে একেবারে গ্রাস করে

ফেলল। জোহানস্‌বর্গ থেকে ডারবান চব্বিশ ঘণ্টার পথ। গাড়ী সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছাল। সে রাত্রে আমার বিন্দুমাত্র ঘুম এল না। পুস্তকে বর্ণিত আদর্শ অনুযায়ী আমি আমার জীবনে পরিবর্তন আনার সঙ্কল্প করে ফেললাম।

আমার মনে হয় আমার জীবনের কয়েকটি দৃঢ়মূল বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি আমি রাস্কিনের ঐ মহান পুস্তিকাখানির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই জন্যেই পুস্তিকাটি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং এর ফলে আমি আমার জীবন পুস্তকের আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করি।

"আন্‌টু দিস্‌ লাস্ট" পড়ার পর তার শিক্ষা নিম্নরূপ বলে আমি বুঝতে পারলাম ঃ

১। সকলের মঙ্গলের মধ্যেই ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল নিহিত।

২। উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই রকম। কারণ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহের সমান অধিকার আছে।

৩। শ্রমজীবি অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকের জীবনই আদর্শ।

এই সব উপদেশের মধ্যে প্রথমটির কথা আমি পূর্বেই জানতাম। দ্বিতীয়টি আমি ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তৃতীয়টির কথা আমার মনে ইতিপূর্বে উদিত হয় নি। 'আনটু দিস্‌ লাস্ট' দিবালোকের ন্যায় আমাকে এই কথা দেখিয়ে দিল যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রথম আদর্শের ভিতরই অন্তর্নিহিত আছে। ভোর বেলা আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। তবে ততক্ষণে এই আদর্শগুলিকে জীবনে মূর্ত করার সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করে ফেলেছি।

: ৩৫ :

ফিনিক্স আশ্রম

আমি তখন 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে একটি পত্রিকা চালাতাম। শ্রীযুক্ত ওয়েস্টের উপর ছাপাখানার কাজকর্ম দেখার ভার ছিল। তাঁর সঙ্গে আমি সমস্ত বিষয় আলোচনা করলাম। 'আনটু দিস লাস্ট' আমার মনে কি প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তা আমি তাঁর কাছে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এই প্রস্তাব করলাম যে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'কে একটি খামার বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হোক্? সেখানে প্রত্যেকে উৎপাদক শ্রম করবে। জীবন নির্বাহের জন্য সকলে সমান পারিশ্রমিক পাবে এবং অবসর সময়ে ছাপাখানার কাজ দেখবে। শ্রীযুক্ত ওয়েস্ট এ-প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য মাথা পিছু মাসিক তিন পাউণ্ড হারে মাসহারা নির্ধারিত হল।

এইভাবে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিনিক্স আশ্রমের সূত্রপাত হল এবং বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে।

আমি যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে ফিরতে পারব—তার আর কোন আশা দেখছিলাম না। স্ত্রীকে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম যে এক বৎসরের মধ্যেই ফিরব। এক বৎসর কেটে গেল। অথচ আমার দেশে ফেরার কোন সম্ভাবনা দেখতে না পাওয়ার দরুণ আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেপেলেদের এখানে নিয়ে আসা স্থির করলাম।

: ৩৬ :

জুলু বিদ্রোহ

ঠিক যখন মনে হচ্ছিল যে এবার একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারব, তখনই এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল। সংবাদপত্র সমূহে নাটালের জুলু বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। জুলুদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিরূপ ভাব ছিল না। তারা কেউ ভারতীয়দের কোন ক্ষতি করে নি। আমার এই "বিদ্রোহ" কথাতেই সন্দেহ ছিল। অবশ্য আমার তখন বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব। নাটালে দেশরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হল।

নিজেকে আমি নাটালের ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত নাটালেরই একজন নাগরিক বলে মনে করতাম। তাই আমি নাটালের গভর্ণর মহোদয়কে লিখলাম যে প্রয়োজন হলে আমি ভারতীয়দের নিয়ে একটি এম্বুলেন্স বাহিনী তৈরী করতে প্রস্তুত আছি। তিনি অবিলম্বে আমার প্রস্তাব স্বীকার করে একটি পত্র দিলেন।

আমি ডারবানে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন জানালাম। আমাকে একটি পদ দেবার জন্য এবং কাজের সুবিধার্থে ও প্রথা অনুযায়ী প্রধান মেডিক্যাল অফিসার আমাকে অস্থায়ী সার্জেণ্ট মেজরের পদে নিযুক্ত করলেন। আমার দ্বারা নির্বাচিত তিন জনকে সার্জেণ্ট এবং আর এক জনকে করপোরালের পদ দেওয়া হল। আমরা সরকারের কাছ থেকে আমাদের পোষাকও পেলাম। আমাদের বাহিনী প্রায় ছয় সপ্তাহ প্রত্যক্ষ কাজ করেছিল। আমাদের প্রধান কাজ ছিল আহত জুলুদের সেবা

করা। এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার আমাদের স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন যে শ্বেতাঙ্গরা আহত জুলুদের সেবা করতে চাইছে না এবং এইজন্য তাদের ঘাগুলি বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল,—এই সব দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছিলেন। আমাদের আগমনকে তিনি এই সব নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বর-প্রেরিত বলে অভিনন্দন জানালেন।

: ৩৭ :

কস্তুরবার সাহস

একবার আমার জনৈক চিকিৎসক বন্ধু আমার স্ত্রীকে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। একটু ইতস্তত করে কস্তুরবা তাতে রাজি হন। কস্তুরবা খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন বলে ডাক্তারকে ক্লোরোফর্ম ছাড়াই অস্ত্রোপচার করতে হয়। অস্ত্রোপচার সফল হলেও তাঁকে খুব কষ্ট পেতে হয়। তিনি অবশ্য অদ্ভুত সাহসিকতার সঙ্গে সব কিছু সহ্য করেন। উক্ত চিকিৎসক বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী এ সময় কস্তুরবার সেবা শুশ্রূষা করেন। অস্ত্রোপচার হয় ডারবানে। এরপর ডাক্তার আমাকে জোহানস্‌বর্গ যাবার অনুমতি দিলেন এবং বললেন যে রোগিনীর জন্য আর কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

তবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি একটি পত্রে জানলাম যে, কস্তুরবার অবস্থা আবার খারাপের দিকে গেছে। তিনি বিছানায় উঠে বসতে পারেন না এবং আর একবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক বন্ধুটি জানতেন যে আমার সম্মতি ছাড়া তাঁকে ঔষধ হিসাবে মদ্য বা মাংস দেওয়া উচিত হবে না। কাজেই

তিনি আমাকে জোহানস্‌বর্গে টেলিফোন করে কস্তুরবাকে "বিফ্‌টি" বা মাংসের সুরুয়া দেবার অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে উত্তর দিলাম যে, আমি এ অনুমতি দিতে অক্ষম। তবে কস্তুরবার যদি নিজ অভিমত প্রকাশ করার মতো অবস্থা থাকে, তবে যেন তাঁর মতামত নেওয়া হয় এবং তিনি এ বিষয়ে আপন অভিরুচি অনুযায়ী চলতে পারেন। কিন্তু চিকিৎসক বন্ধুটি বললেন, "এ বিষয়ে আমি রোগীর ইচ্ছা জানার চেষ্টা করতে পারি না। এ কাজ আপনাকেই এখানে এসে করতে হবে। আর আপনি যদি আমার ইচ্ছা মতো রোগীকে পথ্য দিতে না দেন, তাহলে আমি আপনার স্ত্রীর জীবনের দায়িত্ব নিতে পারব না।"

সেইদিনই আমি ট্রেনে ডারবান রওনা হয়ে গেলাম। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি শান্তভাবে আমাকে বললেন, "আপনাকে টেলিফোন করার আগেই আমি শ্রীমতী গান্ধীকে 'বিফ্‌টি' দিয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি একে প্রতারণা বলব।" ডাক্তার দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "রোগীকে উপযুক্ত ওষুধ বা পথ্য দেবার ব্যাপারে প্রতারণার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা অর্থাৎ চিকিৎসকরা রোগীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন হলে রোগী বা তার আত্মীয় স্বজনকে ঠকান সৎকার্য বলে বিবেচনা করি।"

আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেও শান্ত রইলাম। ডাক্তার ভাল লোক ছিলেন এবং তা ছাড়া তিনি আমার বন্ধু। তিনি এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে আমি অশেষ ঋণী। তবে আমি তাঁর চিকিৎসকোচিত নৈতিকতা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলাম না।

আমি বললাম, "ডাক্তারবাবু, এবার আপনি কি করতে চান বলুন। আমার স্ত্রী যদি স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, তবে আমি তাঁকে পাঁঠার মাংস বা গোমাংস গ্রহণ করতে দেব না। এতে তাঁর প্রাণ যায় তাও স্বীকার।"

"আপনার আদর্শ-পালনে আপনাকে আমি বাধা দেব না। তবে আমি কেবল এইটুকু বলব যে যতক্ষণ আপনি আপনার স্ত্রীকে আমার চিকিৎসাধীন রাখবেন, ততক্ষণ আমার যা উচিত মনে হবে তাই তাঁকে খেতে দেবার অধিকার আমার থাকা চাই। আর এ যদি আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে আমি নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বলব যে আপনি আপনার স্ত্রীকে এখান থেকে নিয়ে যান। কারণ তিনি আমার চোখের সামনে এ বাড়ীতে থেকে মারা যাবেন—এ আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না।"

আমার যতদূর মনে পড়ে আমার এক ছেলে আমার কাছে ছিল। আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে সে বলল—তাদের মাকে "বিফ্‌টি" দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি তারপর স্বয়ং কস্তুরবার সঙ্গে কথা বললাম। সত্য সত্যই তিনি তখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়। কিন্তু আমার মনে হল যে এ আমার কষ্টকর কর্তব্য। ডাক্তারের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল, তার কথা তাঁকে বললাম। তিনি আমাকে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন, "আমি মাংসের সুরুয়া খাব না। এ পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ দুর্লভ ব্যাপার। আমি এই সব অখাদ্য খেয়ে এ শরীরকে অপবিত্র করার চেয়ে বরং তোমার কোলে মাথা রেখে মরব।"

আমি তাঁকে বোঝাতে লাগলাম যে তিনি আমার অনুকরণ করতে বাধ্য নন। আমি তাঁর কাছে আমার পরিচিত এমন সব হিন্দু মিত্রের উদাহরণ দিতে লাগলাম যাঁরা চিকিৎসকের নির্দেশে মদ্য বা মাংস গ্রহণ অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু তিনি অবিচল রইলেন। বললেন, "না, তা হয় না। তুমি কেবল আমাকে এখনই এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে চল।"

কাজেই আমরা তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যাওয়া স্থির করলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল এবং স্টেশন ছিল বেশ একটু দূরে। রেলে আমাদের ডারবান থেকে ফিনিক্স যেতে হবে এবং স্টেশন থেকে আমাদের আশ্রম আড়াই মাইলের পথ। নিঃসন্দেহেই আমি নিজের উপর খুব গুরুতর দায়িত্ব নিচ্ছিলাম। তবে ঈশ্বরের উপব বিশ্বাস ছিল বলে আমি আমার কর্তব্য করে যেতে পারলাম। আমি ফিনিক্সে অগ্রিম খবর পাঠিয়ে শ্রীযুক্ত ওয়েস্টকে স্টেশনে আসার অনুরোধ জানালাম। তাঁকে এক বোতল গরম দুধ, এক বোতল গরম জল এবং একটি ডুলি ও কস্তুরবাকে ডুলিতে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছয়জন লোক জোগাড় করে আনতে খবর পাঠালাম। গাড়ী ধরার জন্য একটি রিক্সা ডেকে তাঁকে সেই বিপজ্জনক অবস্থায় রিক্সায় চড়িয়ে আমি স্টেশনে রওনা হয়ে গেলাম।

কস্তুরবাকে সাহস দেবার প্রয়োজন ছিল না। তিনিই বরং আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, "ভয় করো না, আমার কিছুই হবে না।"

অনেকদিন কোন পুষ্টিকর আহার না পেয়ে তিনি একেবারে

অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিলেন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছিল খুব লম্বা এবং স্টেশনের ভিতর রিক্‌সা নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে গাড়ীতে চড়ার আগে বেশ কিছুটা হাঁটতে হত। আমি তাঁকে কোলে করে নিয়ে গাড়ীতে শুইয়ে দিলাম। ফিনিক্স স্টেশন থেকে তাঁকে ডুলিতে করে আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে জল-চিকিৎসার গুণে তিনি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

ঃ ৩৮ ঃ

ঘরোয়া সত্যাগ্রহ

কিছুদিন ভাল থাকার পর কস্তুরবা আবার অসুখে পড়লেন। তিনি আমার চিকিৎসা প্রণালীর বিরোধ না করলেও এর উপর তাঁর বড় একটা আস্থা ছিল না। তবে অবশ্য তিনি বাইরের কোন সাহায্য চান নি। তাই আমার যাবতীয় ব্যবস্থা-পত্র ব্যর্থ হয়ে যাবার পর আমি নূতন বিধি হিসাবে তাঁকে লবণ ও ডাল খাওয়া ছেড়ে দিতে বললাম। আমার নির্দেশের সপক্ষে বহু তথ্য ও নজির পেশ করলেও তিনি কিছুতেই আমার কথা মানতে রাজি হলেন না। আব শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে বলে বসলেন যে প্রয়োজন হলে আমিও নাকি এই দুটি বস্তু ত্যাগ করতে পারব না। আমার মনে দুঃখ এবং আনন্দ দুইই হল। আনন্দ হল এই ভেবে যে এবার আমি তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা সপ্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছি। তাই তাঁকে বললাম, "তুমি ভুল করছ। আমার

অসুখ হলে ডাক্তার যদি এই সব বা অন্য কোন জিনিস ছেড়ে দিতে বলেন, তবে কোনরকম ইতস্ততঃ না করেই আমি এসব বর্জন করব। কিন্তু দেখ, তুমি ছাড় আর না ছাড়, আমাকে ডাক্তার না বলা সত্ত্বেও আমি লবণ ও ডাল এক বৎসরের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।"

তাঁর মনে খুব আঘাত লাগল এবং দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন, "দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার স্বভাব জানার পরও এভাবে তোমাকে উস্কে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। আমি এসব ছেড়ে দেবার কথা দিচ্ছি। তবে ভগবানের দোহাই তুমি তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমার পক্ষে এ ব্যাপার সহ্য করা বড় কঠিন হবে।"

"তুমি এসব ছেড়ে দেবে শুনে খুব খুশী হলাম। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে লবণ ও ডাল বর্জন করলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল হবে। তবে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলব যে, ভেবে চিন্তে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি, তা আমি ভঙ্গ করতে পারব না। আর এর ফলে আমার উপকারই হবে। কারণ যে কোন কারণের জন্য গৃহীত হক না কেন, সর্ববিধ সংযম মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। এ আমার এক পরীক্ষা। আর তোমার সঙ্কল্প পালনের পথে এক নৈতিক সহযোগীতাও বটে।"

তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তুমি তো এই রকমই একগুঁয়ে। কারও কথা তুমি শোন না।" তারপর চোখের জল ফেলে শান্ত হলেন। এই ঘটনাকে আমি সত্যাগ্রহের

একটি নিদর্শন আখ্যা দেব। আমার জীবনের এক অতীব মধুর ঘটনার স্মৃতি এ। কস্তুরবা এরপর সত্বর আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন।

: ৩৯ :
সত্যাগ্রহের সূচনা

জুলু "বিদ্রোহ" সংক্রান্ত কর্তব্য সেরে আমি ফিনিক্সের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তারপর জোহানস্বর্গ পৌঁছালাম। এইখানে ফেরার পর ট্রান্সভাল সরকারের ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখের এক্স্ট্রা অর্ডিনারি গেজেটে প্রকাশিত খসড়া অর্ডিন্যান্সটির মুসাবিদা আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত চিত্তে পাঠ করলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পূর্ণ সর্বনাশ করা। এই আইন অনুসারে ট্রান্সভালে বসবাস করার অধিকার প্রাপ্ত প্রতিটি নর, নারী বা আট বৎসর কিম্বা তদূর্ধ্বের বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলক ভাবে রেজিস্ট্রার অফ এসিয়াটিক্সের কাছে আপন আপন নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে তার প্রমাণপত্র নিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নাম রেজিস্ট্রি করার জন্য আবেদনকারীদের নিজ নিজ পুরাতন পারমিট রেজিস্ট্রারকে ফেরত দিতে হবে এবং নতুন আবেদনপত্রে তাঁদের নাম, বাসস্থান, জাতি, বয়স ইত্যাদির উল্লেখ করতে হবে। রেজিস্ট্রার আবেদনকারীর দেহে সনাক্তকরণের উপযুক্ত কোন স্থায়ী চিহ্ন দেখবেন এবং আঙ্গুলের টিপ সই নেবেন। যে সব ভারতবাসী একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এই ভাবে

রেজিস্ট্রি করাবেন না তাঁদের ট্রানস্‌ভালে থাকার অধিকার হরণ করা হবে। রেজিস্ট্রির জন্য দরখাস্ত না করা আইনসঙ্গত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং এর জন্য অপরাধীর জরিমানা, জেল বা এমন কি এ দেশ থেকে নির্বাসনও হতে পারে। রাস্তা দিয়ে চলার সময়ও যে কোন ভারতবাসী এই নতুন আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রির প্রমাণ-পত্র দেখাতে বাধ্য থাকবে। পুলিশ কর্মচারীরা যে কোন ভারতীয়ের বাসগৃহে ঢুকে প্রমাণ-পত্র দেখার দাবী জানাতে পারবেন। বিশ্বের কুত্রাপি স্বাধীন মানুষের বিরুদ্ধে এই রকম আইন প্রয়োগ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পর দিবস শহরের প্রমুখ ভারতীয়দের একটি ছোট সভায় আমি অর্ডিনান্সের প্রতিটি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলাম। তাঁরা আমারই মতো বিস্মিত হলেন। উপস্থিত সকলে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করার সিদ্ধান্ত করলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত জনসভা যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ভিতর বিখ্যাত "ফোর্থ রেজল্যুশন" সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতীয়রা সঙ্কল্প করে যে তাদের প্রচণ্ড প্রতিবাদ সত্ত্বেও যদি পূর্বোক্ত অর্ডিন্যান্স আইনে পরিণত হয়, তাহলে তাঁরা এ আইন মানবেন না। এবং এর জন্য যত রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা তাঁরা করবেন।

আমাদের আন্দোলনের নাম কি দেওয়া যায় তা স্থির

করে ওঠা যাচ্ছিল না। শ্রীমগলাল গান্ধী 'সদাগ্রহ' নাম রাখার প্রস্তাব করলেন; কারণ আমরা এক সৎ আদর্শের জন্য দৃঢ়-ভাবে দণ্ডায়মান হবার কথা চিন্তা করছিলাম। শব্দটি আমার পছন্দ হলেও এতে আমি যা বলতে চাইছিলাম তার পুরোপুরি আভাস পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমি এর একটু সংশোধন করে 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি গ্রহণ করা স্থির করলাম। সত্যের ভিতর প্রেম অন্তর্নিহিত। আগ্রহ বা দৃঢ়তা শক্তির দ্যোতক এবং তাই আগ্রহকে শক্তির সমার্থবোধক শব্দও বলা চলে। এইভাবে ভারতীয়দের এই আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ' অর্থাৎ সত্য প্রেম বা অহিংসা সঞ্জাত শক্তিরূপে অভিহিত হল। ইতিপূর্বে আমাদের আন্দোলনকে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বলা হত। কাজেই আমরা অতঃপর এই শব্দের ব্যবহার বর্জন করলাম।

ঃ ৪০ ঃ

কারাবরণ

এসিয়াটিক্ ডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বুঝতে পারলেন যে আন্দোলনের মূল নেতৃবৃন্দ বাইরে থাকলে আন্দোলনের শক্তি খর্ব করা অসম্ভব। তাই তাঁরা আমাদের কয়েক জনকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করলেন।

আমাদের গ্রেপ্তার করার পর ভারতীয় সম্প্রদায় সরকারের জেলখানা ভরে ফেলার সিদ্ধান্ত করেন।

আমরা এক পক্ষ কাল জেলে থাকার পর নবাগত বন্দীদের কাছে খবর পেলাম যে সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া

হওয়ার কথাবার্তা চলছে। প্রস্তাবিত বোঝাপড়ার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করাবেন এবং এইভাবে অধিকাংশ ভারতীয় স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রি করালে সরকার কালা কানুন অর্থাৎ 'এসিয়াটিক্ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' প্রত্যাহার করে নেবেন।

জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে প্রিটোরিয়া নিয়ে যাওয়া হল। আপোষরফার শর্তাবলীতে একটি পরিবর্তন সাধন করার জন্য আমি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সেটি স্বীকৃত হয়! এর পর বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আমি আমার স্বজাতীয়দের এই আপোষ নিষ্পত্তির শর্তাবলী বুঝিয়ে দেবার জন্য নানা স্থানে ঘুরতে লাগলাম।

ঃ ৪১ ঃ

প্রহৃত হলাম

আঙ্গুলের টিপ দিতে আমি সম্মত হওয়ায় জনকয়েক পাঠান আমার উপর ক্রুদ্ধ হন। আমরা স্থির করেছিলাম যে প্রথম দিনে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ টিপ সই দিয়ে সার্টিফিকেট নেবেন। আমার অফিসেই সত্যাগ্রহ পরিষদের কার্যালয় ছিল। সেখানে পৌঁছে দেখি যে মীর আলম নামে জনৈক পাঠান এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মীর আলম আমার পুরাতন মক্কেল এবং তাঁর যাবতীয় কাজকর্মে তিনি আমার পরামর্শ নিতেন। উচ্চতায় তিনি পুরা ছয় ফুট এবং তাঁর

দেহের গড়নও খুব মজবুত ছিল। আজই আমি প্রথম তাঁকে অফিসে ঢোকার পরিবর্তে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এই সর্ব প্রথম আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে নমস্কার করলেন না। অবশ্য আমি অভিবাদন করার পর তিনি প্রত্যভিবাদন করলেন; কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্য ছিল না। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমার চোখে পড়ল এবং এ ব্যাপার মনে গাঁথা হয়ে রইল। বুঝতে পারলাম যে একটা কিছু হবে। সত্যাগ্রহ পরিষদের সভাপতি ইউসুফ মিঞা এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ উপস্থিত হবার পর আমরা এসিয়াটিক্ অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মীর আলম ও তাঁর অনুচররা আমাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।

রেজিস্ট্রেশন অফিসে পৌছাবার একটু আগে মীর আলম আমার সামনে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় চলেছেন?"

আমি বললাম, "দুই হাতের দশ আঙ্গুলের টিপ সই দিয়ে আমি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিতে যাচ্ছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে যান তাহলে আপনার কেবল দুই হাতের দুই আঙ্গুলের টিপ দিয়ে প্রথমে আপনাকে সার্টিফিকেট পাবার ব্যবস্থা করে দেব। তারপর আমি অবশ্য দশ আঙ্গুলেরই ছাপ দিয়ে সার্টিফিকেট নেব।"

শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করা সমাপ্ত হতে না হতেই পিছন থেকে আমার মাথার উপর সজোরে একটি লাঠির আঘাত পড়ল। আমি তৎক্ষণাৎ "হে রাম" বলে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

অচেতন হবার পর কি যে হল তা আমি জানি না। পরে শুনেছিলাম যে জ্ঞান হারাবার পরও মীর আলম ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা আমাকে আরও লাথি ও ঘুষি মেরেছিলেন। ইউসুফ মিঞা এবং থাম্বি নাইডু আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেরাও আহত হয়েছিলেন। এইসব গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে জনকয়েক ইউরোপীয় পথচারী সেদিকে এগিয়ে আসেন। মীর আলম ও তাঁর সঙ্গীরা পালাবার চেষ্টা করলেও ইউরোপীয়রা তাঁদের ধরে ফেলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। আমাকে সকলে ধরাধরি করে শ্রী জে, সি, গীবসনের খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখি শ্রীযুক্ত ডোক আমার মুখের উপর ঝুঁকে আমাকে দেখছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন বোধ করছেন ?"

"এমনিতে ভালই। তবে দাঁত এবং পাঁজরায় ব্যথা রয়েছে। মীর আলম কোথায় ?"

"তাঁকে তাঁর সঙ্গী-সাথী সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"ওঁদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।"

"তা যা হয় হবে। কিন্তু আপনি এখন একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের অফিসে রয়েছেন এবং আপনার ঠোঁট ও গাল ভীষণ ভাবে জখম হয়েছে। পুলিশ আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তবে আপনি যদি আমাদের বাড়ী যান, তাহলে শ্রীমতী ডোক এবং আমি যথাসাধ্য আপনার সেবা শুশ্রূষা করব।"

"তাই ভাল। আমাকে আপনাদের বাড়ীতেই নিয়ে চলুন। পুলিশকে তাঁদের ব্যবস্থার জন্য আমার হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। তাঁদের জানিয়ে দিন যে আমি আপনার সঙ্গেই যেতে ইচ্ছুক।"

এসিয়াবাসীদের রেজিস্ট্রি করার কার্যের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী শ্রীচ্যামনেও এবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। একটি গাড়ীতে করে আমাকে এই মহানুভব ধর্মযাজকের স্মিথ স্ট্রীটের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল এবং একজন চিকিৎসককে ডাকা হল। আমি ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত চ্যামনেকে বললাম, "আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি আপনার দপ্তরে গিয়ে দশ আঙ্গুলের টিপ ছাপ দিয়ে সর্ব-প্রথম রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট নেব। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা ছিল না। যাই হক, এইবার আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে দয়া করে আপনার কাগজপত্র এখানে আনান এবং অবিলম্বে আমার নাম রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা করে দিন। আমি আশা করি আমার আগে আপনি আর কারও নাম রেজেস্ট্রি করবেন না।"

শ্রীযুক্ত চ্যামনে উত্তর দিলেন, "এত তাড়া কিসের? শীঘ্রই ডাক্তার আসছেন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আর সবাইকে সার্টিফিকেট দিলেও তালিকার শীর্ষে আপনারই নাম থাকবে।"

"আমি বললাম, "না, তাহলে চলবে না। বেঁচে থাকলে এবং ভগবানের ইচ্ছা হলে আমিই প্রথম সার্টিফিকেট নেব বলে সঙ্কল্প করেছিলাম। সেইজন্যই আমি বার বার বলছি যে কাগজ-পত্র এখনই এখানে আনান।" এই কথা শুনে শ্রীযুক্ত চ্যামনে কাগজ-পত্র আনার জন্য বিদায় নিলেন।

আমার দ্বিতীয় কাজ হল এটর্নী জেনারেলকে একটি তার করা। এই তারবার্তায় আমি জানালাম যে আমাকে প্রহার করার জন্য আমি মীর আলম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের দোষী মনে করি না। যাই হক না কেন, আমি চাই না যে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়। আমি সেই তারে এই আশা ব্যক্ত করলাম যে ওঁদের যেন অন্ততঃ আমার খাতিরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জোহানস্‌বর্গের ইউরোপীয়রা এটর্নী জেনারেলের কাছে একটি কড়া চিঠি লিখে এই দাবী জানালেন যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর অভিমত যাই হক না কেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় যেন তার রূপায়নের ব্যবস্থা করা না হয়। গান্ধী স্বয়ং এর কোন প্রতিবিধান না চাইলেও তাঁকে যখন প্রকাশ্য রাজপথের উপর মারধর করা হয়েছে, তখন এই ঘটনাকে অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। দোষীকে সাজা দেওয়ার জন্য কয়েকজন ইংরেজ সাক্ষী দিতে প্রস্তুত হলেন। এই সব আন্দোলনের ফলে মীর আলম ও তাঁর একজন সঙ্গীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁদের উপর তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। কেবল আমাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হল না।

ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রচনা করে আমাদের কমিটির সভাপতির মারফৎ পাঠালাম এবং সেটি প্রচার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। বিবৃতিতে আমি লিখেছিলাম ঃ

"শ্রীযুক্ত ডোক এবং তাঁর স্ত্রী আমাকে নিজের ভাইয়ের মতো সেবা করছেন। তাই তাঁদের কাছে আমি স্বাচ্ছন্দ্যে আদি।

শীঘ্রই আমি আবার আমার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম শুরু করতে পারবো বলে আশা করি।

"আমাকে যাঁরা প্রহার করেছিলেন, তাঁরা অজ্ঞান—তাঁরা জানতেন না যে তাঁরা কি করছেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে আমি অন্যায় করেছি। তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। অতএব আমার অনুরোধ তাঁদের বিরুদ্ধে যেন আর কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হয়।"

শ্রীযুক্ত চ্যামনে কাগজপত্র নিয়ে ফিরে এলেন এবং আমি আমার আঙ্গুলের টিপ ছাপ দিলাম। তবে এ সময় যে আমার দুঃখ হয় নি, তা নয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে শ্রীযুক্ত চ্যামনের চোখেও জল। সময় সময় আমাকে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লিখতে হয়েছে; কিন্তু এই ঘটনায় আমি বুঝতে পারলাম যে ঘটনা-চক্রের আবর্তনের ফলে কঠোর মানুষের হৃদয়ও কেমন দ্রব হতে পারে।

: ৪২ :

আবার সত্যাগ্রহ

ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রি করে নিয়েছিলেন। অতএব এইবার কালা কানুন প্রত্যাহার করে নেওয়া সরকারের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু একে প্রত্যাহার করার পরিবর্তে জেনারেল স্মাটস্ এই কালা কানুনকে পাকাপোক্ত ভাবে আইন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করলেন এবং এসিয়াবাসীদের নাম রেজিস্ট্রি করার ব্যাপার ব্যাপকতর করার জন্য আইন সভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই আইনের খসড়া পাঠ করে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সত্যাগ্রহীরা সরকারের কাছে এক 'চরমপত্র' প্রেরণ করল। এতে বলা হল, "এসিয়াটিক্ আইন প্রত্যাহার না করলে ভারতীয়েরা যে সব সার্টিফিকেট নিয়েছে সেগুলিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং এর পরিণামে যাই হক না কেন, তাঁরা তা বিনম্র দৃঢ়তা সহকারে সহ্য করবেন।"

সার্টিফিকেটের প্রকাশ্য বহ্ন্যুৎসব করার জন্য একটি জনসভা আহ্বান করা হল। সভার কার্য আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক একটি তার নিয়ে দ্রুতবেগে সাইকেলে চড়ে উপস্থিত হল। তারবার্তায় সরকারের তরফ থেকে ভারতীয়দের অনমনীয় মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জানান হয়েছিল যে সরকার তাঁদের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে অক্ষম। তারবার্তাটি উপস্থিত জনসমাবেশে পড়ে শোনান হল এবং সরকারের বক্তব্য শুনে জনতা এমনভাবে হর্ষধ্বনি করে উঠল যে মনে হল সার্টিফিকেট পোড়ানর এই শুভ অবসর হাত থেকে চলে না যাওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে।

মীর আলমও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে আমাকে প্রহার করা তাঁর অন্যায় হয়েছিল এবং সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে তিনি তাঁর মূল সার্টিফিকেটখানি পুড়িয়ে ফেলার জন্য আমাদের হাতে দিলেন। মীর আলম আর সকলের মত স্বেচ্ছামূলক রেজেস্ট্রি সার্টিফিকেট নেন নি। আমি আনন্দের আবেগে তার দুই হাত জড়িয়ে ধরলাম এবং পুনরায় তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর প্রতি আমি কদাচ কোন বিরাগ ভাব পোষণ করি নি।

কমিটির হাতে ইতিমধ্যে বহ্ন্যুৎসব করার জন্য দুই হাজারেরও বেশী সার্টিফিকেট এসেছিল। কেরোসিন তেলে ডুবানোর পর মীর হউসুফ মিঞা এগুলিতে অগ্নি সংযোগ করলেন। আগুন যতক্ষণ জ্বলছিল সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের চতুর্দিক ঘিরে উল্লাসধ্বনি করছিলেন। যাঁদের কাছে তখনও সার্টিফিকেট ছিল, তাঁরা তাড়া বেঁধে সেগুলিকে সভামঞ্চের কাছে নিয়ে এলেন এবং সেগুলিকেও জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হল।

সভায় ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের যে সব সংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সংবাদপত্রগুলিতে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন।

যে বৎসর কালা কানুন আইনের স্বীকৃতি পায় জেনারেল স্মাটস্ সেই বৎসরই ট্রানস্ভাল বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিল নামে আর একটি আইন আইন-সভা দ্বারা মঞ্জুর করিয়ে নিলেন। এই আইনের ফলে ট্রানস্ভালে আর একটি ভারতীয়ের আগমনও পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

স্বীয় অধিকারের উপর এই নতুন আক্রমণের প্রতিরোধ করা ভারতবাসীগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক কর্তব্য হয়ে পড়ল। সেইজন্য কয়েকজন সত্যাগ্রহী ইচ্ছা করে ট্রানস্ভালে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের কারারুদ্ধ করা হল। আমিও আবার গ্রেপ্তার হলাম।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সরকার ও সত্যাগ্রহীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন। গোখলের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল যে জেনারেল বোথা

তাঁর কাছে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এক বৎসরের মধ্যে কালা কানুন এবং তিন পাউণ্ড কর দেবার প্রথা প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হল না।

গোখলেকে আমি এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের সংবাদ দিলাম এবং পরবর্তী আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

এ যাবত আমরা মেয়েদের কারাবরণ করতে দিই নি। কিন্তু এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার একটি ফতোয়া জারী করেন। যে সব বিবাহ খ্রীষ্টান প্রথা অনুসারে অনুষ্ঠিত করা হয় নি এবং ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যে-সব বিবাহ রেজিস্ট্রি করা হয় নি, এই ঘোষণা অনুযায়ী সে-সবই অবৈধ হয়ে গেল। এইভাবে কলমের এক আঁচড়ে হিন্দু, মুসলমান এবং জোরোস্ট্রিয়ান বিধি মতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিবাহ বে-আইনী হয়ে গেল এবং সংশ্লিষ্ট বিবাহ সমূহের যাবতীয় পত্নী বারাঙ্গনার পর্যায়ভুক্ত হলেন ও তাঁদের সন্তান সন্ততির আর পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার উপায় রইল না। কেবল পুরুষদের পক্ষেই নয় ভারতীয় নারীদের কাছেও এ অবস্থা অসহ্য প্রতীয়মান হল।

নারী জাতির এই অসম্মানের সামনে ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। যে কয়জন সত্যাগ্রহী পাওয়া যাক না কেন, আমরা দৃঢ় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন নারীদের যে কেবল সংগ্রামে যোগদান করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল তাই নয়, আমরা তাঁদেরকে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলার জন্য আহ্বান জানাতে মনস্থ করলাম।

মহিলাদের কারাবরণ নিউক্যাসলের নিকটস্থ খনি শ্রমিকদের

উপর যাদু মন্ত্রের মত প্রভাব বিস্তার করল। তাঁরা নিজেদের হাতিয়ারপত্র ফেলে রেখে দলে দলে শহরে আসতে লাগলেন। আমি এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিনিক্স থেকে নিউক্যাসল্ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম।

শ্রমিকরা গুণতিতে দু'দশজন ছিলেন না, তাঁদের সংখ্যা ছিল শত শত। আর অত্যন্ত সহজে এই সংখ্যা সহস্রের কোঠায় পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই ক্রমবর্ধমান জন-সমুদ্রকে আশ্রয় দেওয়া ও তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করা এক চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল। বিনা কাজে এত শ্রমিককে এক জায়গায় রেখে তাদের তত্ত্বাবধান করা নেহাৎ অসম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। আমি এর এক রাস্তা ভেবে বার করলাম। এই "বাহিনী"কে আমি ট্রানস্‌ভালে নিয়ে গিয়ে নিরাপদে জেলে পুরে দেওয়া স্থির করলাম। ইতিমধ্যে এদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে পরিণত হয়েছে।

: ৪৩ :

সত্যাগ্রহের বিজয়

সহস্র সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলে রেখে দেবার শক্তি সরকারের ছিল না। ভাইসরয় এ অবস্থা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না এবং সমগ্র জগত জেনারেল স্মাটসের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এ অবস্থায় অন্য যে কোন সরকার যা করেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও তাই করলেন। একটি কমিশন নিয়োগ করে তাঁরা এই জাতীয় অস্বস্তিকর পরিবেশের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এইসব কমিশনের সুপারিশ সরকার সচরাচর গ্রহণ করেন এবং তাই এতদিন সরকার যে ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন, এবার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করার ছদ্মাবরণে তা দেওয়া হয়। জেনারেল স্মাটস্ তিন জনের এক কমিশন নিযুক্ত করলেন।

কমিশনের কার্য-পরিচালন-পদ্ধতি নিয়ে আমার সঙ্গে জেনারেল স্মাটসের পত্রালাপ হল এবং শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ রফাও হল। কমিশন তাঁদের সুপারিশে ভারতীয় সম্প্রদায়ের দাবী স্বীকার করে নিলেন এবং এই সুপারিশ প্রকাশিত হবার অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী গেজেটে 'ইণ্ডিয়ানস্ রিলিফ বিলের' খসড়া প্রকাশিত হল। এই বিল অনুসারে তিন পাউণ্ড করের প্রথা রদ হল, ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিবাহ আইনসঙ্গত বলে স্বীকৃতি পেল এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ ছাপযুক্ত ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ভারতীয়দের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের যথোপযুক্ত দলিলরূপে ঘোষিত হল।

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভাতীয়দের আট বৎসর ব্যাপী মহান সত্যাগ্রহের অবসান হল এবং এবার দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ শান্তি পাবে বলে মনে হল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই আমি ইংলণ্ড হয়ে দেশে রওনা হলাম। আফ্রিকায় আমি দীর্ঘ একুশ বৎসর কাটিয়েছিলাম এবং মানব-জীবনের তিক্ত ও মধুর—সব রকমের অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিলাম। এছাড়া আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপলব্ধিও এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই হয়েছিল। সুতরাং চিরতরে এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

নবম খণ্ড

ভারতে প্রত্যাবর্তন ও আশ্রম স্থাপন

: ৪৪ :

-পুণা পৌঁছালাম

এত বৎসর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে আসা সত্য সত্যই আনন্দের বিষয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর গোখলে ও সার্ভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির * সদস্যবৃন্দ আমাকে স্নেহধারা বর্ষণে অভিভূত করে ফেললেন। আমার যতদূর মনে পড়ে যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের সকলকেই গোখলে একত্র আহ্বান করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বহু বিষয়ে আমার প্রাণ খোলা আলোচনা হয়েছিল।

ফিনিক্সের মত পরিবারসহ বসতে পারি এমন একটি আশ্রম স্থাপন করা আমাব উদ্দেশ্য ছিল। আমি গুজরাটেই বসার কথা ভাবছিলাম। কারণ আমি স্বয়ং গুজরাটী হওয়ায় গুজরাটের মাধ্যমে স্বদেশ সেবা আমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট হবে বলে আমি মনে করতাম। গোখলের এ প্রস্তাব মনঃপুত হল। তিনি বললেন, "এই-ই তোমার পক্ষে ভাল হবে। আর আশ্রমের খরচ খরচা

---

* গোখলে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের সেবার জন্য সোসাইটি কর্তৃক নির্ধারিত মাসহারাতে আজীবন কাজ করার সঙ্কল্প এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিতে হয়। রাজনীতি, সমাজসেবা, অর্থনীতি ও শিক্ষাদান ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে এর সদস্যবর্গ কাজ করে থাকেন। রাজনীতিতে এঁরা নরমপন্থী। প্রতিষ্ঠানটি অসাম্প্রদায়িক এবং এঁরা জাতিভেদ মানেন না। সমগ্র দেশে এঁদের দ্বারা পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠান আছে।

আমার কাছ থেকে নিও। কারণ তোমার আশ্রম আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠান বলেই বিবেচনা করি।"

আমার হৃদয় আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠল। চাঁদা ওঠাবার হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাওয়া নিঃসন্দেহেই সুখের কথা।

: ৪৫ :

আশ্রম স্থাপনা

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে আহমেদাবাদের কাছে কোচরবে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হল। আমরা সবশুদ্ধ পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় পঁচিশজন ছিলাম। সকলের রান্না-খাওয়া এক জায়গায় হত এবং আমরা এক পরিবারের মতো থাকার চেষ্টা করতাম।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের এক অচিন্তানীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। অমৃতলাল ঠক্কর আমাকে এক পত্রে লিখলেন, "একটি সৎ অথচ দরিদ্র অস্পৃশ্য পরিবার আপনার আশ্রমে যোগদান করতে চায়। আপনি কি তাঁদের গ্রহণ করবেন?"

আমি অমৃতলাল ঠক্করকে লিখলাম,—"তাঁরা যদি আশ্রমের নিয়মাবলী পালন করতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে এখানে তাঁদের গ্রহণ করতে আমরা সম্মত আছি।"

তাঁরা সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তাদের আশ্রম-পরিবারভুক্ত করা হল।

কিন্তু এব ফলে আমাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক মিত্রবর্গের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। কূপ ব্যবহার করা নিয়ে সর্বপ্রথম অসুবিধা দেখা দিল। কারণ কূয়ার মালিকানার উপর আর

একজনের স্বত্ব ছিল। তাঁদের জল তোলার লোকটি বলে বসল যে আমাদের বালতির জলের ছিটে লাগলে সে অপবিত্র হয়ে যাবে। সে তাই আমাদের নানারকম গালাগালি করা আরম্ভ করল। আমি সকলকে এসব বরদাস্ত করার পরামর্শ দিলাম এবং বললাম,—যাই হক না কেন, জল তোলা বন্ধ করা চলবে না। লোকটি যখন দেখল যে তার গালাগালি শুনে আমরা কেউ উত্তেজিত হয়ে তার প্রতি কোনরূপ কটূক্তি করছি না, তখন সে নিজে থেকে লজ্জিত হয়ে আমাদের উত্যক্ত করা ছেড়ে দিল।

তবে সব রকম অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপর আমাদের সামাজিক বয়কট করার গুজব শোনা গেল। আমরা এ সবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। সঙ্গী সাথীদের আমি জানিয়ে দিলাম যে আমাদের বয়কট করে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা না দিলেও আমরা আহমেদাবাদ ছেড়ে চলে যাব না। আমরা বরং "অস্পৃশ্য" পল্লীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে থাকব এবং শরীর-শ্রম করে যা পাওয়া যায় তাতেই দিন চালাব কিন্তু এই অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করব না।

ক্রমশঃ ব্যাপার এমন শোচনীয় হয়ে উঠল যে মগনলাল গান্ধী একদিন এসে আমাকে খবর দিলেন যে আমাদের হাতে আর টাকা পয়সা নেই এবং আগামী মাসে খাওয়া জুটবে না। আমি শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "আমরা তাহলে 'অস্পৃশ্য' পল্লীতেই যাব।"

অগ্নি-পরীক্ষা আমার জীবনে এই প্রথম নয়। পূর্বে সর্বদা এ জাতীয় অবস্থায় ভগবান শেষ মুহূর্তে সাহায্য পঠিয়েছেন। মগনলাল গান্ধী আমাদের আর্থিক দুর্দশার সংবাদ দেবার কয়েক

দিনের মধ্যেই একদিন সকালে আশ্রমের একটি ছেলে এসে আমাকে খবর দিল যে বাইরে একটি মোটরে বসে একজন শেঠ আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। শেঠজী বললেন, "আমি আশ্রমে কিছু সাহায্য করতে চাই। আপনার নিতে কোন আপত্তি নেই তো ?"

আমি বললাম, "খুবই আনন্দের সঙ্গে সাহায্য গ্রহণ করব। আব আপনার কাছে স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে এ সময় আমাদের টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে।"

তিনি বললেন, "কাল আমি এই সময়ে আসব। আপনি কি থাকবেন তখন ?"

আমি সম্মতি জানালাম এবং তিনি তখনকার মতো চলে গেলেন।

পর দিবস ঠিক ঐ সময় তাঁর মোটর আমাদের বাসস্থানের কাছে এসে থামল এবং তারপর মোটরের ভেঁপু বেজে উঠল। ছেলেরা আমাকে খবর দিল। শেঠজী ভিতরে আসেন নি। আমিই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলাম। তিনি আমার হাতে ১৩, ০০০ টাকার নোট দিয়ে মোটর নিয়ে চলে গেলেন।

আমি এ সাহায্য পাব বলে আশা করি নি। আর সহায়তা দেবার পদ্ধতিও কী অদ্ভুত! ভদ্রলোক ইতিপূর্বে কখনও আশ্রমে আসেন নি। আমার যতদূর মনে পড়ে জীবনে তাঁকে আমি ঐ একবারই দেখেছি। আগে আসা নেই, কোন প্রশ্ন নেই, কেবল এসে সাহায্য করে চলে যাওয়া! আমার পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। আমরা এবার এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হলাম।

দশম খণ্ড

চম্পারণে

ঃ ৪৬ ঃ

নীলের কলঙ্ক

চম্পারণের কৃষককে আইন দ্বারা তার জমিদারের জন্য নিজের মোট জমিব কুড়ি ভাগেব তিন ভাগে নীলের চাষ করতে বাধ্য করা হত। এর নাম ছিল 'তিন কাঠিয়া' প্রথা। বিঘা প্রতি তিন কাঠা জমিতে নীল চাষ করতে হত বলে এই প্রথার এই নাম হয়।

রাজকুমার শুক্ল নামে একজন কৃষক এই প্রথার দ্বারা উৎপীড়িত হয়। তাই সে আমাকে চম্পারণ গিয়ে স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা দেখতে অনুরোধ করে।

আমি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কলকাতা থেকে চম্পারণ রওনা হলাম। চম্পারণের কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করে নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের কি অভিযোগ আছে জানার জন্য আমি চম্পারণ যেতে মনস্থ করি। এইজন্য হাজার হাজার রায়তের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তবে আমার মনে হল যে এই তদন্তে হাত দেবার পূর্বে এ সম্বন্ধে নীলকরদের বক্তব্য জেনে নেওয়া উচিত এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গেও একবার সাক্ষাৎ করা কর্তব্য। উভয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই আমার সাক্ষাতকারের প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

নীলকর সমিতির সম্পাদক আমাকে জানিয়ে দিলেন যে আমি বহিরাগত বলে তাঁদের ও নীল চাষীদের মধ্যে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমার কোন বক্তব্য থাকলে আমি তাঁদের লিখিত ভাবে জানাতে পারি। আমি তাঁকে নম্র ভাবে জানিয়ে দিলাম যে আমাকে আমি মোটেই বহিরাগত বলে মনে করি না এবং নীল-চাষীদের যদি অভিরুচি হয়, তাহলে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার সর্ববিধ অধিকার আমার আছে।

কমিশনার সাহেব আমাকে অবিলম্বে ত্রিহুত বিভাগ ছেড়ে যাবার পরামর্শ দিলেন।

সহকর্মীদের আমি সব ঘটনার কথা জানালাম এবং বললাম যে সরকার হয়ত এ নিয়ে আর এগোতে দেবে না ও আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ত আমাকে জেলে যেতে হবে। আমার তাই মনে হল যে যদি গ্রেপ্তার হতেই হয়, তাহলে মোতিহারী বা সম্ভব হলে বেতিয়াতে গ্রেপ্তার হওয়াই ভাল। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র আমার ঐ এলাকায় হাজির হওয়া উচিত বলে মনে হল।

চম্পারণ হচ্ছে বিহারের ত্রিহুত বিভাগের একটি জেলা এবং মোতিহারীতে এর সদর কার্যালয়। রাজকুমার শুক্লের বাড়ী বেতিয়ার কাছে ছিল এবং ঐ সব অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা চম্পারণ জেলার ভিতর সবচেয়ে দরিদ্র। রাজকুমার শুক্লের আগ্রহ ছিল যে আমি ঐ এলাকা পরিদর্শন করি এবং আমারও এ সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় ইচ্ছা ছিল।

তাই আমি সেই দিনই আমার সহকর্মীদের নিয়ে মোতিহারী রওনা হলাম। আর ঐ দিনই আমাদের কাছে খবর পৌঁছাল যে মোতিহারী থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি কৃষকের উপর অত্যাচার হয়েছে। স্থির হল যে পর দিবস প্রত্যুষে বাবু ধরণীধর প্রসাদ সহ আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই কৃষকটির সঙ্গে দেখা করব। যথা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা একটি হাতীর পিঠে চড়ে ঘটনাস্থলে রওনা হলাম। অর্ধপথ যাবার পূর্বেই পুলিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্টের নির্দেশ নিয়ে তাঁর জনৈক কর্মচারী এসে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে পুলিশ সাহেব আমাকে সেলাম পাঠিয়েছেন। এর অর্থ আমি বুঝতে পারলাম। ধরণীধরবাবুকে ঘটনাস্থলে যাবার পরামর্শ দিয়ে আমি পুলিশ সাহেবের কর্মচারী যে ভাড়াটে মোটর গাড়ীটি এনেছিলেন তাতে চড়ে বসলাম। পুলিশ কর্মচারীটি তখন আমার উপর চম্পারণ জেলা ছেড়ে চলে যাবার এক নির্দেশ জারী করে আমাকে আমাদের বাসস্থানের দিকে নিয়ে চললেন। আমাকে পুলিশ সাহেবেব নির্দেশের প্রাপ্তি স্বীকার করতে বলা হলে আমি লিখে দিলাম যে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি চম্পারণ ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছুক নই। অতঃপর আমার উপর এক সমন জারী করে জানান হল যে চম্পারণ ত্যাগ করার নির্দেশ অমান্য করার জন্য পর দিবস আদালতে আমার বিচার হবে।

আমার উপর চম্পারণ ত্যাগ করার নির্দেশ জারী ও তা অমান্য করার জন্য সমন জারীর কথা দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি খবর পেলাম যে সেদিন মোতিহারীতে অভূতপূর্ব

দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। গোরখবাবুর বাড়ী এবং আদালত-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। সৌভাগ্যবশতঃ আমার কাজকর্ম রাত্রেই সেরে রেখেছিলাম বলে আমি কোনমতে ভিড়ের ঝামেলা সামলে নিলাম। আমার সঙ্গী সাথীরাও খুব কর্ম তৎপরতা দেখালেন। জনস্রোত সর্বত্র আমার পশ্চাদনুসরণ করছিল বলে তাঁদের সর্বদা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল।

এই ব্যাপারের জন্য কলেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারইন্-টেন্‌ডেণ্ট ইত্যাদি সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমার উপর যে সব নির্দেশ জারী করা হয়েছিল, আইনসঙ্গত ভাবে আমি তার প্রতিরোধ করতে পারতাম। তা না করে আমি সেগুলিকে গ্রহণ করেছিলাম এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমার আচরণও ছিল অতীব ভদ্র। এই জন্য তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মে গেল যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কোন রকমে অসম্মান করতে চাই না, আমার লক্ষ্য হচ্ছে তাঁদের নির্দেশের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন করা। এই ভাবে তাঁরাও আমাদের প্রতি খুব ভদ্র আচরণ করা আরম্ভ করলেন। তাঁরা আমাদের উত্যক্ত ও বিব্রত করার পরিবর্তে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি কার্যে আমার ও আমার সহকর্মীদের সহায়তা নিতে লাগলেন। তবে তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে তাঁদের কর্তৃত্বের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে গেছে। অন্ততঃ এখনকার মতো জনসাধারণের মনে আর শাস্তির ভয় নেই এবং তারা এখন তাদের নবলব্ধ মিত্রদের প্রেমশক্তির কাছে আনুগত্য প্রকট করছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে চম্পারণে আমি একেবারে অপরিচিত ছিলাম। তবুও চম্পারণবাসীগণ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যে আমি যেন তাঁদের কতদিনের পুরাতন বন্ধু। কৃষকদের সঙ্গে এই সম্পর্কের ফলে আমি ঈশ্বর, অহিংসা ও সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলাম-—এ কথা কোন মতেই অতিরঞ্জন নয়। আমার কাছে এ এক বাস্তব সত্য। চম্পারণের সেই দিনটি আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় এবং কৃষক সম্প্রদায় ও আমার পক্ষে এ এক অতীব গৌরবজনক পুণ্য-লগ্ন।

বিচার শুরু হল। সরকারী উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা ইতিকর্তব্য স্থির করতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

সাজা গ্রহণ করার জন্য আদালতে হাজির হবার পূর্ব মুহূর্তে বিচারের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে লিখিতভাবে জানালেন যে বিহারের লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর মহোদয় আমার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা প্রত্যাহার করে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা কলেক্টরও আমাকে লিখে পাঠালেন যে আমি অবাধে প্রস্তাবিত তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে পারি এবং সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে আমি যে কোন রকম সাহায্য পাবার অধিকারী। এত সত্বর এই রকম ভাল ভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এ কথা আমরা কেউ চিন্তা করতে পারি নি।

হাজার হাজার কৃষক তাদের জবানবন্দী দিল। আমরা যেখানে বসে জবানবন্দী লিখতাম তার আশে পাশে চতুর্দিকে এই সব কৃষক ও তাদের সঙ্গী সাথীদের জন্য লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত।

: ৪৭ :

কলঙ্ক অপসারিত হল

নিত্যই অধিকাধিক সংখ্যক রায়ত আমাদের কাছে জবানবন্দী দেবার জন্য আসছে দেখে নীলকরদের উষ্মা বেড়েই চলল এবং আমাদের তদন্ত কার্য বন্ধ করে দেবার জন্য তাঁরা চতুর্দিক তোলপাড় করা শুরু করলেন।

কিন্তু লেফ্‌টন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড গ্যেট আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন এবং জানালেন যে তিনি একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে ইচ্ছুক ও আমাকে ঐ কমিটির সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

কমিটি রায়তদের সপক্ষে রায় দিল এবং প্রস্তাব করল যে নীলকররা চাষীদের কাছ থেকে এযাবত অন্যায় ভাবে যা আদায় করেছেন, তার একাংশ ফেরত দিতে হবে। কমিটি এও সুপারিশ করল যে 'তিন কাঠিয়া' প্রথাকে আইন দ্বারা উচ্ছেদ করা উচিত।

এই ভাবে বিগত এক শতাব্দী যাবত যে 'তিন কাঠিয়া' প্রথা চলে আসছিল, তার অবসান হল এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নীলকরদের রাজত্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

একাদশ খণ্ড

আহমেদাবাদের শ্রমিকদের কথা

ঃ ৪৮ ঃ

শ্রমিকদের সম্পর্কে এলাম

এই সময় আহমেদাবাদের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমতী অনুসূয়াবেনের কাছ থেকে আমার সাহায্য চেয়ে একটি পত্র এল। শ্রমিকদের বেতন অতি অল্প ছিল এবং বহুদিন যাবত তারা এর জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি তাদের সাহায্য করতে উৎসুক হয়ে উঠলাম এবং এই উদ্দেশ্যে আহমেদবাদে উপনীত হলাম।

সেখানে পৌঁছে আমাকে এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হল। শ্রমিকদের দাবী অবশ্য ন্যায্য ছিল। তবে শ্রীমতী অনুসূয়াবেনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅম্বালাল সরাভাইএর সঙ্গে লড়তে হচ্ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন মিল মালিকদের নেতৃস্থানীয়। তাঁদের সঙ্গে আমার খুবই মিত্রতার সম্বন্ধ ছিল এবং এইজন্য সংগ্রাম আরও কঠিন হয়ে পড়ল। আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম এবং এই বিবাদকে কোন সালিসীর হাতে ছেড়ে দেবার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তাঁরা নীতিগত কারণে সালিসী প্রথা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন।

কাজেই আমি এই শ্রমিকদের ধর্মঘট করার পরামর্শ দিলাম। তবে এ পরামর্শ দেবার পূর্বে আমি শ্রমিক-সমাজ ও তাঁদের নেতৃবর্গের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলাম এবং তাঁদের বললাম যে সাফল্য সহকারে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিধানাবলী পালন করা অপরিহার্য ঃ

১। কখনও হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে না।

২। ধর্মঘট-বিরোধী শ্রমিকদের উপর কোন রকম জোর জুলুম করা চলবে না।

৩। ধর্মঘট কালে চাঁদার উপর নির্ভর করে থাকা কোন মতেই উচিত হবে না।

৪। যতদিনই ধর্মঘট চলুক না কেন ধর্মঘটীদের দৃঢ় থাকতে হবে ও ধর্মঘট চলার সময় অন্য কোন সৎ পন্থায় জীবিকা অর্জন করতে হবে।

ধর্মঘটের নায়করা আমার বক্তব্য বুঝলেন এবং আমার শর্তাবলিও গ্রহণ করলেন। তদনুযায়ী শ্রমিকরা এক প্রকাশ্য সভায় সমবেত হয়ে সঙ্কল্প করলেন যে তাঁদের দাবী পূর্ণ না হলে অথবা দাবী বিচার করার জন্য মিল মালিকেরা সালিস নিয়োগ না করলে তাঁরা কেউ কাজে যোগদান করবেন না।

প্রথম দুই সপ্তাহ শ্রমিকরা যথেষ্ট মনোবল ও আত্ম-সংযমের পরিচয় দিলেন ও এই সময় দৈনিক তাঁরা বিরাট জনসভায় মিলিত হতেন। সভায় আমি তাঁদের সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম এবং তাঁরা সমবেত কণ্ঠে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেন যে কথার খেলাপ করার চেয়ে তাঁরা বরং মৃত্যু বরণ করবেন।

কিন্তু ক্রমশঃ তাঁদের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হলাম এবং এই অবস্থায় আমার কি কর্তব্য এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

একদিন সকালে শ্রমিকদের সভা চলছিল। তখনও আমি কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে অন্ধকারেই পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। সভায় আমি শ্রমিকদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আলোর দর্শন পেলাম। একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজে থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ধর্মঘটী শ্রমিকরা আবার ঐক্যবদ্ধ হরতাল চালিয়ে মালিকদের সঙ্গে একটা রফায় না পৌঁছান পর্যন্ত অথবা তাঁদের চিরতরে মিলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত আমি কোন আহার্য গ্রহণ করব না।"

শ্রমিকদের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। অনুসূয়াবেনের গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। শ্রমিকরা চিৎকার করে উঠলেন, "আপনি নয়, আমরাই উপবাস করব। আপনার অনশন করা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হবে। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার জন্য এবারকার মত ক্ষমা করুন। এবার আমরা কথা দিচ্ছি যে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনার কাছে অনুগত থাকব।"

উত্তরে আমি বললাম, "আপনাদের অনশন করার প্রয়োজন নেই। আপনাদের নিজ সঙ্কল্পে অটুট থাকাই যথেষ্ট। আপনারা জানেন যে আমাদের হাতে সঞ্চিত অর্থ নেই এবং জনসাধারণের কাছ থেকে দান নিয়ে আমরা এ ধর্মঘট চালাতে চাই না। অতএব বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু না হলে নয়, তা আপনাদের কোন রকমের মজুরী করে উপার্জন করতে হবে। তাহলে ধর্মঘট যতদিন

চলুক না কেন, আপনাদের কোন উদ্বেগের কারণ ঘটবে না। ধর্মঘটের একটা নিষ্পত্তি হবার পরই আমার অনশন শেষ হবে।"

অনুস্য়াবেন এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক প্রথম দিনে আমার সঙ্গে অনশন করলেন। তাঁদের উপবাস যাতে আরও দীর্ঘস্থায়ী না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল।

এর পরিণামে চতুর্দিকে একটা শুভেচ্ছার পরিবেশ সৃষ্টি হল। এই ঘটনা মিল মালিকদেরও হৃদয় স্পর্শ করল এবং তাঁরা একটা আপোষ রফার পথ খুঁজতে লাগলেন। অনুস্য়াবেনের বাড়ীতে তাঁরা আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। শ্রীআনন্দ-শঙ্কর ধ্রুব মধ্যস্থতা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেই এ ব্যাপারে সালিস নিয়োগ করা হল। এইভাবে আমার উপবাসের মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল। মিল মালিকরা শ্রমিকদের মধ্যে মিঠাই বণ্টন করে এই শুভ ঘটনা আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করলেন এবং ধর্মঘট আরম্ভ হবার একুশ দিনের মধ্যে এইভাবে তার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

দ্বাদশ খণ্ড

খেড়া সত্যাগ্রহ

ঃ ৪৯ ঃ

খেড়া সত্যাগ্রহ

আমি অবশ্য একটু নিঃশ্বাস নেবারও অবকাশ পেলাম না। আহমেদাবাদের ধর্মঘট শেষ হতে না হতেই আমাকে খেড়া সত্যাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল।

অনাবৃষ্টির দরুণ খেড়া জেলায় প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছিল। খেড়ার পটিদাররা তাই সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছিলেন যে সে-বছরের ভূমি-রাজস্ব যেন আদায় করা না হয়।

ভূমি-রাজস্বের নিয়মানুসারে চার আনা বা তার কম ফসল হলে সেবছর খাজনা আদায় বন্ধ রাখার দাবী জানাবার অধিকার রায়তদের ছিল। সরকারী হিসাব মতে ফসল চার আনার উপরে হয়েছিল। অপর পক্ষে চাষীদের বক্তব্য ছিল—ফসল চার আনার কম হয়েছে। কিন্তু সরকার তাঁদের কথায় কর্ণপাত করবেন বলে কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে যখন যাবতীয় আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হল, তখন আমি সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পটিদারদের সত্যাগ্রহ করার পরামর্শ দিলাম।

জনসাধারণ প্রথমাবস্থায় প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিলেও সরকার খুব একটা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু জনসাধারণের দৃঢ়তা তিলমাত্র হ্রাস পাবার লক্ষণ দেখা না দেওয়াতে সরকার অতঃপর দমননীতির আশ্রয় নিলেন। সরকারী কর্মচারীরা চাষীদের গবাদি পশু বিক্রি করতে

লাগলেন এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। অনেকের উপর ক্রোক পরোয়ানা জারী হল এবং বহু ক্ষেত্রে খেতের ফসলও বাজেয়াপ্ত করা গেল।

সরকারী দমননীতির দরুণ যাঁদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তাঁদের সাহস দেবার জন্য আমি শ্রীমোহনলাল পাণ্ড্যার নেতৃত্বে একদল কৃষককে একটি খেত থেকে পিঁয়াজ তুলে আনার নির্দেশ দিলাম। আমার মতে অন্যায় ভাবে ঐ খেতের ফসল ক্রোক করা হয়েছিল। এইভাবে সরকারী হুকুম অমান্য করার পরিণাম হচ্ছে জেল ও জরিমানা। এই ঘটনার দ্বারা কৃষক-সমাজকে এই উভয়বিধ সরকারী দমননীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার এক সু-অবসর এসেছে বলে আমার মনে হল। আর শ্রীমোহন-লাল পাণ্ড্যার কাছে তো এ একেবারে মনের মতো কাজ। তিনি তাই সানন্দে খেত থেকে পিঁয়াজ তুলতে গেলেন এবং এ ব্যাপারে আরও সাত আট জন তাঁর সঙ্গী হলেন।

সরকারের পক্ষে তাঁদের কোন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অতএব তাঁরা গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু এর ফলে জনসাধারণের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। জেলে যাবার ভয় কেটে গেলে সরকারী দমননীতি জনগণের মনের জোর বাড়িয়ে দেয়।

এক বিরাট শোভাযাত্রা "আসামীদের" জেল ফটক পর্যন্ত অনুগমন করল এবং সেইদিন থেকে শ্রীমোহনলাল পাণ্ড্যা জনসাধারণের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁদের কাছ থেকে 'ডুংলি চোর' (পিঁয়াজ চোর) আখ্যা পেলেন। আজও তিনি ঐ নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত।

এই সংগ্রামের অবসানের জন্য আমি এমন একটা সম্মানজনক সিদ্ধান্তের অনুসন্ধান করছিলাম, যা সত্যাগ্রহীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। অকস্মাৎ এইরকম একটি সুযোগ এসে উপস্থিত হল। নদিয়াদ তালুকার মামলতদার আমার কাছে খবর পাঠালেন যে স্বচ্ছল অবস্থার পটিদারেরা খাজনা দিয়ে দিলে তিনি গরীবদের রেহাই দিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এর লিখিত প্রতি-শ্রুতি চাইলাম এবং তা পেয়েও গেলাম। সমগ্র জেলার ব্যাপারে কলেক্টরই কেবল এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন বলে ব্যাপারটা আমি তাঁর গোচরীভূত করলাম এবং জানতে চাইলাম যে মামলতদারের প্রতিশ্রুতি সমস্ত জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না। তাঁর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, ইতিপূর্বেই তাঁর তরফ থেকে ঐ মর্মে নির্দেশ জারী করা হয়েছে। আমি এ কথা জানতাম না। তবে এ ঘটনা সত্য হলে বলতে হবে যে জন জনসাধারণের দাবী পূর্ণ হয়েছে। আমরা তাই এই নির্দেশের কথা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করলাম।

খেড়া সত্যাগ্রহ গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে এক নব চেতনার সূচনা করে। এর পরিণামে তাঁদের ভিতর যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। জনসাধারণের ভিতর এই বোধ গভীর হল যে তাঁদের মুক্তি তাঁদের নিজেদেরই হাতে। নিজেদের দুঃখ কষ্ট বরণ ও আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার উপরই তাঁদের সমস্যাবলীর সমাধান নির্ভরশীল। খেড়ার আন্দোলনের ফলে গুজরাটের মাটীতে সত্যাগ্রহ দৃঢ়মূল হল।

ঃ ৫০ ঃ

মরণের মুখোমুখি

ঐ সময় আমার মুখ্য খাদ্য ছিল চীনা বাদামের মাখন ও লেবু। আমি জানতাম যে এই মাখন বেশী খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়; কিন্তু তবুও খাওয়া বন্ধ করি নি। এর ফলে আমি আমাশয়ে আক্রান্ত হলাম।

সেদিন কি একটি পর্ব ছিল। কস্তুরবাকে যদিও আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে দুপুরে আমি কিছু খাব না, তবু তিনি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন এবং আমিও তাঁর উপরোধের কাছে নতি স্বীকার করলাম। দুধ বা দুগ্ধজাত কোন দ্রব্য গ্রহণ করব না বলে আমার এক সঙ্কল্প ছিল। তাই তিনি আমার জন্য বিশেষ করে ঘি-এর বদলে তেল দিয়ে আটার লাড্ড তৈরী করেছিলেন। এছাড়া আমার জন্য কিছু ভিজান মুগও ছিল। এসব খেতে আমি ভালবাসতাম বলে নিঃসঙ্কোচে খেয়ে নিলাম। ভাবলাম যে এমন অল্প পরিমাণে খাব যাতে কস্তুরবারও মন রাখা চলে এবং আমারও খিদে মেটে। কিন্তু শয়তান কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। খুব অল্প খাবার বদলে আমি পেট ভরেই খেলাম। মৃত্যুদূতকে আহ্বান করার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট সিদ্ধ হল এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রচণ্ড আমাশয়ের লক্ষণ দেখা দিল।

কোন ওষুধ না খেয়ে আমি আমার মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যন্ত্রণা ভোগ করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করলাম। সমস্ত দিনে ত্রিশ থেকে চল্লিশ বার পায়খানা হল। প্রথম প্রথম এমন কি আমি ফলের রসও বর্জন করে সম্পূর্ণ উপবাস করলাম।

আহারে কোন রকম রুচি ছিল না। মনে হল আমি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছি।

এই ভাবে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিন গুনতে গুনতে যখন কাটাচ্ছি তখন শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার স্বাস্থ্যের রক্ষক হয়ে উঠলেন এবং তিনি ডাঃ দালালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য জিদ করতে লাগলেন। অতএব তাঁকে ডাকা হল। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা দেখে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম।

তিনি বললেন, "আপনি দুধ না খেলে আমি আপনার শরীর সারাতে পারব না। এর উপর আপনি যদি আয়রণ ও আর্সেনিক ইন্‌জেক্‌শন নেন, তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি যে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করে দেব।"

আমি উত্তর দিলাম, "আপনি ইন্‌জেক্‌শন দিতে পারেন ; কিন্তু দুধের ব্যাপার আলাদা। দুধ খাব না বলে আমি সঙ্কল্প নিয়েছি।

চিকিৎসক প্রশ্ন করলেন, "আপনার সঠিক সঙ্কল্পটি কি ?"

আমি তাঁকে আমার সঙ্কল্পের কারণ ও ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বললাম যে, গরু ও মহিষের দুধ ফুকা প্রথায় দোহন করা হয়, সেই জন্য আমার মনে দুগ্ধপানে তীব্র অনিচ্ছার সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া আমার বরাবরই মনে হয় যে দুধ মানুষের স্বাভাবিক আহার্য নয়। তাই আমি সম্পূর্ণভাবে দুগ্ধ বর্জনের সংকল্প নিয়েছি।

কস্তুরবা এযাবত আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে এই সব কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি এবার বললেন, "তাহলে ছাগলের দুধ সম্বন্ধে তো তোমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।"

ডাঃ দালালও বললেন, "ছাগলের দুধ পান করলেও আমার কাজ চলবে।"

আমি নতি স্বীকার করলাম। সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পরিচালনার তীব্র ইচ্ছাই আমার ভিতর বেঁচে থাকবার আকূল আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কাজেই আমি আমার সঙ্কল্পের আক্ষরিক অর্থ পালন করেই নিরস্ত রইলাম। সঙ্কল্পের অন্তর্নিহিত ভাব এইভাবে বিসর্জন দেওয়া হল। কারণ সঙ্কল্প গ্রহণ করার সময় গো-মহিষের দুধের কথা মনে থাকলেও আমার সঙ্কল্পের স্বাভাবিক অর্থই হচ্ছে সর্বপ্রকার প্রাণীর দুগ্ধ বর্জন করা। আর তা ছাড়া আমি যখন মনে করি যে দুধ মানুষের স্বাভাবিক আহার্য নয় তখন দুগ্ধপান করার কথা কোন রকমে ওঠেই না। কিন্তু এ সব জেনেও আমি ছাগলের দুধ পান করা স্থির করলাম। এই ঘটনার স্মৃতি এখনও আমার মনে পীড়া দেয় এবং কি করে ছাগলের দুধও ছাড়া যায় সে সম্বন্ধে আমি প্রতিনিয়ত চিন্তা করি। কিন্তু এখনও আমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন প্রলোভন থেকে মুক্ত করতে পারি নি, সেবা করার আকাঙ্খা এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

ছাগলের দুধ খাওয়া আরম্ভ করার কিছু দিন পরেই ডাঃ দালাল আমার দেহে এক অস্ত্রোপচার করলেন এবং এ অস্ত্রোপচার সফল হল। আরোগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার ভিতর বেঁচে থাকার ইচ্ছা জাগল এবং ভগবানও আমার জন্য অনেক কাজ জমা করে রেখেছিলেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড

রাউলাট আইন ও রাজনীতিতে প্রবেশ

ঃ ৫১ ঃ

রাউলাট আইন

সুস্থ হয়ে উঠেছি এই বোধ ভাল করে জাগার পূর্বেই সংবাদ পত্র পাঠ করতে করতে হঠাৎ সদ্য প্রকাশিত রাউলাট কমিটির রিপোর্টের প্রতি আমার চোখ পড়ল। কমিটির সুপারিশসমূহ দেখে আমি চমকে উঠলাম। বল্লভভাই আমাকে প্রায় রোজই দেখতে আসতেন। তাঁকে আমি আমার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বললাম, "এখন একটা কিছু তো করা দরকার।" তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি?" আমি জবাব দিলাম, "যদি জন কয়েক লোকও প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করেন এবং এই প্রতিরোধের সূচনা সত্ত্বেও যদি প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহ আইনে পরিণত হয়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ সত্যাগ্রহ করব। আমি যদি এই ভাবে শয্যাশায়ী হয়ে না পড়তাম তবে একাই এর বিরুদ্ধে লড়তাম এবং আশা করতাম যে আর সকলে আমার অনুগমন করবে। কিন্তু আমার এখনকার এই অসহায় অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এ কাজের অনুপযুক্ত মনে হচ্ছে।"

বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য তখনও গেজেটে প্রকাশ

রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনসমূহ দমন করার উদ্দেশ্যে সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেবার জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাউলাট আইন পাশ হয়। এর ফলে কেউ সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে নিযুক্ত আছে বলে সন্দেহ হলে তাকে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার সরকারের হাতে আসে।

করা হয় নি। আমার শরীর তখন খুবই দুর্বল ; কিন্তু মাদ্রাজ থেকে একটি নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি এই দীর্ঘ পথ রেলে চড়ে যাবার ঝুঁকি নিতে মনস্থ করলাম। রাজাগোপালাচারী তখন সদ্য সালেম থেকে মাদ্রাজে এসে আইন ব্যবসায় শুরু করেছেন। আমরা উভয়ে প্রত্যহ সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেও জনসভার অনুষ্ঠান করা ছাড়া অন্য কোন রকম কার্যসূচীর কথা সে সময় আমার মাথায় আসে নি।

এই ভাবে আমরা যখন মতামতের আদান-প্রদান করছি তখন খবর পাওয়া গেল যে রাউলাট বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। সে রাত্রে শোবার সময় এই ব্যাপারেই চিন্তা করছিলাম। পরদিবস অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হল। মনে হল যেন অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তখনও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ভাবে কাটে নি, আমি যেন জাগরণ ও সুপ্তির মাঝে বিচরণ করছি। হঠাৎ যেন স্বপ্নের মতোই আমার মনে এক কল্পনা জাগল। বেলা হলে রাজাগোপালাচারীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম ঃ—

"কাল রাত্রে যেন এক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমার মনে হল যে সর্বাত্মক হরতাল পালন করার জন্য সমগ্র দেশের অধিবাসীকে আহ্বান জানান উচিত। সত্যাগ্রহ হচ্ছে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া এবং আমাদের এ সংগ্রাম হল অত্যন্ত পবিত্র। তাই আমার মনে হয়, কোন আত্মশুদ্ধির কার্যক্রমের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের সূত্রপাত হওয়া প্রয়োজন। অতএব ভারতের সবাই যেন সেদিন সর্ববিধ কাজকর্ম বন্ধ রাখেন এবং উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা এই দিবস পালন করেন।"

রাজাগোপালাচারী তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। অন্যান্য মিত্রদেরও এ সম্বন্ধে জানাবার পর তাঁরাও এর সমর্থন করলেন। আমি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদনপত্রের খসড়া প্রস্তুত করলাম। প্রথমে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ হরতালের দিন ধার্য করা হয়েছিল। পরে এর পরিবর্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হয়। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি নগর ও গ্রামে ঐ দিন সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য !

৭ই রাত্রে আমি দিল্লী এবং অমৃতসর অভিমুখে রওনা হলাম। গাড়ী পালওয়াল রেল স্টেশনে পৌছাবার পূর্বেই আমার উপর পাঞ্জাবের সীমানার মধ্যে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। এর কারণ প্রসঙ্গে জানান হল যে আমি পাঞ্জাব গেলে সেখানে শান্তি-ভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ আমাকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে বললেন। আমি এ নির্দেশ অমান্য করে বললাম, "পাঞ্জাব থেকে বার বার আমন্ত্রণ পেয়েই আমি সে প্রদেশে যাচ্ছি। অশান্তি সৃষ্টি করা নয়, এর অবসানই আমার লক্ষ্য।"

অতএব পালওয়াল স্টেশনেই আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে পুলিশের হেপাজতে রাখা হল। শীঘ্রই দিল্লী থেকে একটি গাড়ী এল। আমাকে পুলিশ-পাহারায় একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠান হল। মথুরায় উপনীত হবার পর আমাকে পুলিশ-ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আমাকে নিয়ে যে কি করা হবে বা এর পরে আমাকে কোথায় যেতে হবে—এ সম্বন্ধে পুলিশের কোন কর্মচারী বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। পরের দিন ভোর চারটায় আমাকে জাগিয়ে তুলে একটি বোম্বাইগামী মালগাড়ীতে

চড়িয়ে দেওয়া হল। বোম্বাই পৌঁছে আমাকে মুক্তি দেওয়া হল।

আমার গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে শহরে তখন খুব গোলযোগ চলছিল। আমি একটি মোটর গাড়ীতে চড়লাম। পিধুনীর কাছে এক বিরাট জন-সমাবেশ চোখে পড়ল। আমাকে তাঁরা দেখতে পেয়ে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ একটি শোভাযাত্রা বেরুল এবং 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। কিছুদূর যেতেই একদল অশ্বারোহী পুলিশের দেখা পাওয়া গেল। তারপর উপর থেকে ইষ্টক বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। জনতার কাছে আমি শান্ত থাকার আবেদন জানালাম। তবে বোঝা যাচ্ছিল যে ইষ্টক বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা নেই। শোভাযাত্রা আবদুর রহমান স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ক্রফোর্ড মার্কেটে প্রবেশ করার মুখে অশ্বারোহী পুলিশের কাছ থেকে বাধা পেল। আমরা যাতে ফোর্ট এলাকায় না ঢুকতে পারি তার জন্য এখানেই আমাদের গতিরোধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শোভাযাত্রা অত্যন্ত জনসমাকীর্ণ ছিল। জনতা এক রকম পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে ফেলেছিল বলা চলে। ঐ জনসমুদ্রে আমার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—এর কোন সম্ভাবনাও ছিল না। অশ্বারোহী পুলিশ-বাহিনীর নেতা ঠিক ঐ সময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দিলেন এবং পুলিশ দলও তৎক্ষণাৎ তাদের হাতের বল্লম নিয়ে ভীড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শোভা-যাত্রার সুব্যবস্থিত ভাব আর রইল না এবং জনতার অধিকাংশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালান শুরু করল। কেউ পায়ের তলায়

চাপা পড়ল এবং পড়ে গিয়ে কারও বা আবার হাত পা ভীষণ ভাবে জখম হল। অশ্বারোহী পুলিশেরা অন্ধভাবে ভীড়ের মধ্য দিয়ে তাদের পথ করে নিচ্ছিল। তারা যে কি করছে এ তাদের নিজেদেরই চোখে পড়ছিল কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সমগ্র ঘটনাস্থল এক ভয়াবহ দৃশ্যে পরিণত হল। চূড়ান্ত গণ্ডগোল ও কলরবের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী ও জনতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

এই ভাবে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করা হল। তবে আমাদের মোটর গাড়ীটি এগিয়ে চলল। পুলিশ কমিশনারের দপ্তরের সামনে গাড়ী থামিয়ে আমি অশ্বারোহী পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ দায়ের করলাম।

খবর পাওয়া গেল যে আহমেদাবাদেও গোলযোগ হয়েছে। আমি সেখানে রওনা হলাম। সংবাদ পেলাম যে নাদিয়াদ রেল-স্টেশনের কাছে রেল লাইন তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, বীরমগাঁও-এ একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আহমেদাবাদে সামরিক আইন জারী হয়ে গেছে। জনসাধারণ সর্বত্র ভীতিবিহ্বল। তাঁরা যে হিংসামূলক আচরণ করেছিলেন এখন সুদে-আসলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে।

স্টেশনে আমার জন্য জনৈক পদস্থ পুলিশ-কর্মচারী অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে কমিশনার শ্রীযুক্ত প্রাটের কাছে নিয়ে গেলেন। দেখলাম তিনি রেগে লাল হয়ে আছেন। আমি অত্যন্ত ভদ্র ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম ও এই সব গোলযোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। আমি এও জানালাম যে এখানে সামরিক

আইন জারী করার কোন প্রয়োজন নেই এবং শান্তি স্থাপন করার যাবতীয় প্রচেষ্টায় আমার পূর্ণ সহযোগীতার প্রস্তাবও তাঁর কাছে উপস্থাপিত করলাম। সবরমতী আশ্রমের ময়দানে একটি জনসভা আহ্বান করার জন্য আমি তাঁর অনুমতি চাইলাম। এ প্রস্তাব তাঁর মনঃপুত হল এবং যতদূর মনে পড়ছে ১৩ই এপ্রিল রবিবার দিন প্রস্তাবিত জন-সভা অনুষ্ঠিত হল। সেই দিন বা তাবপর দিন সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। জনতার কাছে বক্তৃতা-দান-প্রসঙ্গে আমি তাঁদের অন্যায় আচরণের অযৌক্তিকতা বোঝাবার চেষ্টা করলাম ও জনতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই সব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিন দিন অনশনে থাকব বলে ঘোষণা করলাম। জনতার কাছে আমি অনুরূপ কারণের জন্য এক দিন উপবাসী থাকার আবেদন জানালাম এবং যাঁরা হিংস্র কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের নিজ দোষের কথা স্বীকার করার পরামর্শ দিলাম।

আমার কর্তব্য আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। যেসব শ্রমিকের মধ্যে আমি এত সময় কাটিয়েছি, সাধ্যমত যাঁদের আমি সেবা করেছি ও যাঁদের কাছে আমি এর চেয়ে অনেক ভাল আচরণ আশা করেছি, তাঁদের এই ভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা আমার পক্ষে অসহনীয় ছিল। আমার মনে হল আমিও তাঁদের অপরাধের ভাগীদার।

আমি মন স্থির করে ফেললাম। জনসাধারণ যত দিন না শান্তির মর্যাদা বুঝতে শেখে, ততদিন সত্যাগ্রহ মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত করলাম।

ঃ ৫২ ঃ

পর্বতপ্রমাণ ভুল

আহমেদাবাদের পর আমি তাড়াতাড়ি নাদিয়াদে যাই, "পর্বতপ্রমাণ ভুল" (হিমালয়ান মিস্‌ক্যালকুলেশন্) নামে আমার যে কথাটি বিখ্যাত হয়ে পড়েছে নাদিয়াদেই প্রথমে তা আমি বলি। আহমেদাবাদ ও নাদিয়াদে জনসাধারণ আন্দোলনের সময় যেসব হিংসামূলক কাজ করেছিলেন তা দেখে অস্পষ্ট ভাবে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। খেড়া জেলায় এই একই কারণে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছেন জানার পর এক জনসভায় যখন আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ কথাটি আমার মুখ থেকে বার হয়। আমার মনে হয় আগে অহিংসার ভিত্তিতে ভাল ভাবে জনসাধারণকে তৈরী না করে তাঁদের অহিংস আইন অমান্য করতে বলে আমি খুব ভুল করেছি।

কথাটা স্বীকার করায় অনেকে আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। আমি কিন্তু আমার স্বীকারোক্তির জন্য দুঃখীত হই নি। আমি চিরকাল বিশ্বাস করি যে অপরের তাল-সমান ভুলকে তিলের মত ছোট করে দেখা উচিত এবং নিজের তিলের মত ভুলকে দেখতে হয় তালের মত বড় করে। সত্যাগ্রহীর তো বিশেষ করে এই নিয়ম পালন করাই উচিত।

যাই হক ঐ পর্বতপ্রমাণ ভুল কি এবারে তা দেখা যাক। অহিংস আইন অমান্যের অধিকার তাঁরই হয় যিনি কর্তব্য হিসাবে সচরাচর রাষ্ট্রের আইন মেনে চলেন। আইন ভঙ্গ করলে সাজা পেতে হবে—এই ভয়ের জন্য মানুষ সাধারণতঃ আইন

মেনে চলে, কিন্তু আইন থাক বা না-ই থাক সৎ মানুষের মনে চুরি করার কথা ঠাঁই পায় না। আবার চুরি করতে অনিচ্ছুক অনেক সৎ ব্যক্তিরই রাত্রে বাতি না জ্বালিয়ে সাইকেল চালাতে বাধে না। তাহলে সত্যাগ্রহীর মনোভাব কেমন হবে? সমাজ অথবা রাষ্ট্রের যেসব আইন মেনে নেবার যোগ্য স্বেচ্ছায় ধর্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে তিনি সেসব মেনে চলবেন। এই রকম নিষ্ঠা সহকারে যিনি নিয়ম কানুন মেনে চলেন একমাত্র তাঁর পক্ষেই কোন্ নিয়ম ন্যায়সঙ্গত ও কোন্ নিয়ম অন্যায় তা বেছে নেওয়া সম্ভব। এই অবস্থায় কোন-কোন ক্ষেত্রে কোন-কোন আইন ভঙ্গ করার অধিকার তাঁর জন্মায়। কিন্তু জনসাধারণের এই রকম অধিকার জন্মাবার পূর্বেই বাউলাট আইনের বিরোধিতা প্রসঙ্গে তাঁদের আমি আইন ভঙ্গ করতে বলেছিলাম। এইটাই ছিল আমার "পর্বতপ্রমাণ ভুল।"

খেড়া জেলাতে প্রবেশ করতেই খেড়া সত্যাগ্রহের বহু পুরাতন কথা আমার মনে পড়ে। অবাক্ হয়ে ভাবি এই সহজ কথাটা এত দিন আমার মনে আসেনি কেন? আমি বুঝতে পারি অহিংস আইন অমান্যের অধিকার জন্মাবার পূর্বে তার গভীর তাৎপর্য ভাল ভাবে বোঝা দরকার। লোককে অহিংস আইন অমান্য করতে বলার পূর্বে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করা দরকার যাঁরা জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের আদর্শ বোঝাতে পারবেন এবং প্রয়োজনমত তাঁদের পথ প্রদর্শকের কাজও করতে পারবেন।

চতুর্দশ খণ্ড

খাদির জন্ম

ঃ ৫৩ ঃ

খাদির জন্ম

সবরমতীতে সত্যাগ্রহ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সময়েই আমরা সেখানে কয়েকটি তাঁত বসিয়েছিলাম।

আশ্রমবাসীদেব হাতে তৈরী বস্ত্র দ্বারা সকলেব প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে নেওয়াই তখন আমাদেব লক্ষ্য ছিল। আমরা তাই অবিলম্বে কলের কাপড পরা ছেড়ে দিলাম এবং আশ্রমের প্রত্যেকে ভারতের সূতায় প্রস্তুত হাতে বোনা কাপড় পরার সিদ্ধান্ত করলাম। এইভাবে মিলের সূতা হাতে বুনে নিয়ে পরা শুরু করার জন্য ও অন্যান্য সকলের ভিতর এইরূপ কাপড় পরার কথা প্রচার করার জন্য আমরা ভারতীয় সূতা কলগুলির স্বতঃ-প্রণোদিত প্রচারকে পরিণত হলাম। এর পরিণামে আমরা আবার কাপড়ের কলগুলির সংস্পর্শে এলাম। আমরা দেখলাম যে কাপড়ের কলগুলির লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমে ক্রমে তাদের দ্বারা উৎপন্ন সবটুকু সূতাই কলে বুনাইএর ব্যবস্থা করা। তাঁতীদের সঙ্গে তাদের সহযোগীতা মোটেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নয়। আপাততঃ গত্যন্তর না থাকার জন্য এ সম্পর্ক নিতান্ত সাময়িক। আমরা তাই নিজেদের সূতা কেটে নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে এ না করা পর্যন্ত আমাদের

মিলের উপর নির্ভরতা থেকেই যাবে। ভারতীয় সূতা-কলগুলির এজেণ্ট হয়ে যে আমরা দেশের কোন সেবা করতে পারব -- এ ধারণা আমাদের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও জাগে নি।

কিন্তু সূতা কাটার কোন সাজ-সরঞ্জাম আমাদের কাছে ছিল না আর এই কাজ শেখাবার মত কাউকে আমরা জানতামও না। আশ্রমের প্রায় প্রতিটি আগন্তককেই তাই আমি সূতাকাটা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতাম।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার গুজরাটী বন্ধুরা আমাকে ব্রোচের শিক্ষা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য নিয়ে যান। এইখানেই আমি সর্ব প্রথম শ্রীমতী গঙ্গাবেন মজুমদার নাম্নী এক মহিয়সী মহিলার দর্শন পাই। তাঁর কাছে আমি চরখার অলভ্যতা-জনিত আমার মনোবেদনা ব্যক্ত করি এবং তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আমার জন্য তিনি চরখা খুঁজে বার করবেনই। আর শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করেছিলেন!

সমগ্র গুজরাট খুঁজে খুঁজে অবশেষে বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে গঙ্গাবেন চরখার আবিষ্কার করলেন। সেখানে বেশ কয়েকজনের ঘরেই চরখা ছিল; কিন্তু অনেকদিন যাবত তাঁরা একে অপ্রয়োজনীয় কাঠের টুক্‌রা মনে করে অবহেলা ভরে ফেলে রেখেছিলেন। কেউ যদি তাঁদের নিয়মিত ভাবে পাঁজ সরবরাহ করেন এবং তাঁদের সূতা কিনে নেন তাহলে তাঁরা আবার সূতা কাটা আরম্ভ করবেন বলে গঙ্গাবেনকে কথা দিলেন। গঙ্গাবেন এই আনন্দ-জনক খবর আমাকে জানালেন। পাঁজ সরবরাহ করা বেশ কঠিন ব্যাপার বলে মনে হল।

পরলোকগত ওমর সোবনী মহাশয়কে একথা জানাতে তিনি তাঁব কাপড়ের কল থেকে প্রয়োজনীয় পাঁজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমাদের এ অসুবিধা দূর কবেন।

তবে বরাবব তাঁর কাছ থেকে পাঁজ নিই, এ আমার মনঃপুত হচ্ছিল না। তা ছাড়া কলেব পাঁজ ব্যবহার কবা আমাব কাছে মৌলিক কারণে অন্যায় বলে মনে হচ্ছিল। কলেব পাঁজ ব্যবহার কবলে কলের সূতা ব্যবহার না কবাব আব কারণ কি? প্রাচীন-কালে কাটুনীদের তো আব কল থেকে পাঁজ সরবরাহ করা হত না। তাঁরা তাহলে কি ভাবে নিজেদের পাঁজ তৈরী করতেন? এইসব ভেবে আমি গঙ্গাবেনকে বললাম যে এবার ধুনকরদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে যাতে কাটুনীরা পাঁজ পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বেশ আত্মপ্রত্যয় সহকারে এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করলেন। একটি ধুনকর যোগাড় করে তিনি তাঁকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। তিনি কম পক্ষে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা মজুরী দাবী করলেন। তবে সে সময় টাকা আমার প্রধান বিবেচ্য ছিল না। গঙ্গাবেন ধোনা তুলা থেকে পাঁজ করার কায়দা কয়েকটি ছেলেকে শিখিয়ে দিলেন। এইভাবে দ্রুত আশ্রমে চরখা প্রবর্তিত হতে লাগল।

: ৫৪ :

বিদায়

এবার এ রচনার উপসংহার করার সময় হয়ে এসেছে। এরপর থেকে আমার জীবনের কথা প্রায় প্রকাশ্য কাহিনী বলে জনসাধারণের অবিদিত বিশেষ কিছু নেই। আর সত্যিকথা বলতে কি আমার কলমও যেন আর এগোতে চাইছে না।

পাঠকদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি সখেদেই। আমার জীবনে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমি উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকি। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি যোগ্যতা সহকারে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি কি-না, জানি না। তবে এইটুকু বলব যে এর যথাযথ বর্ণনা করার জন্য আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি। আমার কাছে সত্য যেরূপে প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যক্ত করার অবিরত প্রযত্ন আমি করেছি। আর এই প্রচেষ্টায় আমি প্রভূত পরিমাণে মানসিক শান্তি পেয়েছি। কারণ আমার মনে কেন জানি একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে এই প্রচেষ্টা হয়ত পথভ্রান্তদের মনে সত্য ও অহিংসার প্রতি বিশ্বাস পুনঃ সংস্থাপনের সহায়ক হবে।

জীবনে কোন দিনও আমার মনে হয়নি যে সত্য থেকে পরমেশ্বর আলাদা। সত্যময় হওয়ার একমাত্র পথ অহিংসা। হাজার হাজার সূর্য একত্র করলেও যে সত্যরূপী পরমেশ্বরের তেজের পরিমাপ পাওয়া যায় না আমার সত্যের দৃষ্টি সেই সূর্যের একটি কিরণের কণা মাত্র। এই সত্য-সূর্যের পূর্ণ দর্শন পূর্ণ অহিংসা ছাড়া কখনও সম্ভব নয়।

এই ব্যাপক সত্যনারায়ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে হলে জীবমাত্রের প্রতি আত্মবৎ প্রেমের উদয় হওয়া আবশ্যক। আত্মশুদ্ধি ছাড়া জীবমাত্রের সহিত একত্ববোধ আসে না। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসার আরাধনা একেবারেই অসম্ভব। অশুদ্ধাত্মা পরমাত্মার দর্শন পেতে পারে না।

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ অত্যন্ত দুর্গম। পরিপূর্ণ শুদ্ধ হওয়া মানে চিন্তায় বাক্যে ও কার্যে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হওয়া, রাগদ্বেষ রহিত হওয়া। এই নির্বিকারত্ব লাভের জন্য আমি নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছি। আমি জানি এর জন্য আমাকে একেবারে শূন্য হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ নিজেকে স্বেচ্ছায় সর্বাপেক্ষা দীন করে ফেলতে না পারে সে পর্যন্ত তার মুক্তি নেই। অহিংসা মানে নম্রতার পরাকাষ্ঠা। এই নম্রতা ছাড়া মুক্তি পাওয়া যায় না।

বিদায়ের পূর্বে পরমেশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা তিনি যেন আমাকে চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে পরিপূর্ণ অহিংস হওয়ার শক্তি দেন।

সমাপ্ত